জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। একমাত্র পুত্রকে সুদূর বিদেশে পাঠাইয়া পিতামাতা উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেন। তাহার পরে সেই পুত্র ব্যারিষ্টার হইলেন। আমরা সেই নূতন ব্যারিষ্টারকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া কি আনন্দেই আনন্দআশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচন। পাত্রী আর মনোমত হয় না, অবশেষে কুমিল্লার তৎকালীন 'গভর্ণমেণ্ট প্লীডার' কৈলাস চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুসুমনলিনী আমার মনোনীত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে পাত্রীরূপে দেখিতে যাই। তার পরে বিবাহের আয়োজন, বরবরণ, শুভবিবাহ, আনন্দআশ্রমে নববধূর শুভাগমন সে সকল মনে হয় সে দিনের কথা। তখনকার অতি সুখের দিনে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম এত শীঘ্রই মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে প্রভাতের সুখের জীবন লীলা শেষ হইয়া যাইবে? আজ যে তাঁহার প্রাণের অধিক 'নলিনী' আমাদের কত আদরের ভালবাসার বৌদিদি পতিশোকে পাগলিনী হইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, আজ যে তাহার নয়নের মণি সন্তান চতুষ্টয় পিতৃশোকে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে। কত লোক কত ভাবে তাঁহার জন্য ক্রন্দন ও হাহাকার করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কাহারও স্বার্থ সম্বন্ধ মাত্র ছিল কাহারও রক্তের সম্বন্ধ কাহারও বা অকৃত্রিম ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের হৃদয় শোকে মুহ্যমান, বিশাল পুরী একেবারে অন্ধকার। এই সেদিন তিনি স্ত্রী পুত্রকন্যাদিগকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিয়া বাড়ী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নিজের মনোমত করাইয়াছেন। হলঘরে chamber আনিবেন কোনটা প্রসূন কোনটা বা আদরের কন্যা প্রণতির পাঠ গৃহ, কোনটা বা অতিথি অভ্যাগতের জন্য এইরূপ সকল গৃহের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সবে মাত্র সাজসজ্জা আনিয়া আপনার ইচ্ছামত সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোন বাসনা ত তাঁহার পূর্ণ হইল না, কিছু যে ভোগ করিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মসমাজের বা যে কোন পরিবারের যে কোন অনুষ্ঠান যত বৃহৎই হউক না কেন তাঁহাকে তাহার সুব্যবস্থার ও রন্ধন করাইবার ভার দিয়াই সকলে নিশ্চিন্ত হইতেন, তিনি তাহা সুসম্পন্ন করাইয়া তবে বিশ্রাম বা আহার করিতেন। নিজগৃহে ছোটখাট নিমন্ত্রণ ব্যাপারে তিনি নিজহস্তে রন্ধন করিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেন, পুরুষদের মধ্যে এরূপ রন্ধন নৈপুণ্য দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল অন্যের কুব্যবহারে আঘাত পাইলে প্রতিদানে তাহাকে কখনও আঘাত করিতেন না। প্রকাশ্য ভাবেই হয়ত কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাব বৈলক্ষণ্য দেখি নাই। সামান্য দোষ ক্রটীর জন্য আমি কত সময়ে তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাঁহার দোষ আছে কি না তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বলিতেন, রাগ করাত দূরের কথা। তিনি কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু পাঠে গভীর অনুরাগ থাকায় অবসর সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি শিশু বয়সে তিনি রুগ্ন ছিলেন কিন্তু আমার যতদিনের কথা মনে পড়ে, তাঁহাকে

সবল ও সুস্থ দেখিয়া আসিতেছি। অবশ্য ২।৪ বার যে রোগ হয় নাই এমন নহে, তাহার মধ্যে নারায়ণগঞ্জে কলেরার আক্রমণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহায্য করিত সন্দেহ নাই তথাপি স্বীকার করিতে হইবে তাঁহার খাটিবার শক্তি অসাধারণ ছিল এবং নানা ভাবে খাটিয়াই গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃকীর্ত্তি ও অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখিতে সস্ত্রীক প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। পিতৃপ্রতিষ্ঠিত নব্যভারত সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার জন্য কি কঠিন পরিশ্রমই না করিতেন। জটিল মোকদ্দমার মীমাংসা chamber এর কাজ, নব্যভারতের সম্পাদকতা, পুত্রকন্যাদের আহার বিহারের তত্ত্বাবধান, রোগ হইলে মাতার ন্যায় তাহাদের শুশ্রূষা, সংসার সুব্যবস্থা একজন ব্যক্তি কতদিকে খাটিতেন ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। তিনি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন এবং কোনও কাজে পশ্চাৎপদ হন নাই। ট্যাক্সি সমিতির সভাপতিরূপে, Prisoner's aid societyর সম্পাদকরূপে, ১৯১৭ এবং ১৯২০ সনের কংগ্রেস সভামণ্ডপ নির্ম্মাণের কর্ত্তৃপক্ষরূপে তিনি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি পিতৃমাতৃভক্ত, পত্নীগত প্রাণ, সন্তানবৎসল ছিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি অম্লান বদনে বহুক্লেশ সহ্য করিতেন। তাহার ধন জনের অভাব ছিল না কিন্তু নিজহাতে সন্তানগণের অনেক কাজই করিতেন। আফিস হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, হয়ত ছোটছেলেটি অসুস্থ হইয়াছে কিম্বা তার বড় মেয়েটার আহার হয় নাই কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, অমনিই সন্তান বৎসল পিতা তাহাদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারিটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং সংসার অনভিজ্ঞা পত্নী কেবলমাত্র যাহাকে অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল, সে অবলম্বন টুকু হইতে বিধাতা কেন যে তাহাদের বঞ্চিত করিলেন, কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? আমরা শোকে অন্ধ ও স্বার্থহানিতে ব্যথিত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে সন্দিহান হইয়া অধীর হইয়া পড়ি। রোগাক্রমণের পর বারবার তিনি বলিয়াছেন 'I want to live' আমরা তাই আক্ষেপ করিতেছি তাঁহার ত যাবার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ সময়ে যে ইচ্ছা হয় নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে কাতরতার চিহ্নমাত্র ছিল না। শেষ সময়ে অধরপ্রান্তে মধুর হাসিটুকু কি তাঁহার শান্তি ও প্রসন্নতার পরিচয়ই দিতেছে না? মনুষ্য মাত্রেরই ভুল ত্রুটী থাকে কিন্তু নশ্বরদেহ চিতায় ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমরলোকযাত্রীর যত দোষত্রুটী সকলই বিনষ্ট হয়, যেটুকু ভাল, যেটুকু বিশেষত্ব শুধু সেইটুকু উজ্জল হইয়া উঠে। শ্রাদ্ধবাসরে সেইজন্যই প্রিয়জনের গুণাবলী স্মরণ ও গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করে। এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমরা হারাণোধনকে পাইতে চাই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

ছিন্ন কুসুম।

রজনীতে ফোটা ফুল ঝরে যায় প্রাতে,
প্রভাতের ফুল ঝরে সাঁঝের বেলায়,
প্রভাত-কুসুম তার জীবন প্রভাতে
ঝরিয়া পড়িল কেন আজি অবেলায়?

কত সাধ কত আশা হৃদয়েতে তার
কেমনে করিবে সেবা দেশ-জননীর
আহরিয়া প্রেম-ফুলে বিচিত্র সম্ভার
বক্ষ অলঙ্কিবে মত সহ বন্দিনীর।

রচিয়া নূতন করি পুরাতন ঘর
সাজাবে তাহারে, বুকে ভরি ভালবাসা
সন্তানের কল্পনার মন্দিরে সুন্দর
বাঁধিয়া রাখিবে তারে ছিল কত আশা।

বীণাপাণি বীণা-তারে নবতর সুর
ঝঙ্কারি তুলিবে তারা মোহিতে জগৎ,
সেবিবে শ্রমিক দীনে কুলি ও মজুর,
নব প্রাণে জাগাইবে নবীন ভারত।

এত সাধ, এত আশা, আগ্রহ আকুল
এক পলে হয়ে গেল একেবারে শেষ?
কেন ভরা বৃন্ত—ঝরে, আধ ফোটা ফুল
ভাসে না পবনে তার সৌরভের লেশ?

প্রেম নাকি মৃত্যুঞ্জয়, আশা অন্তহীন?
জীবন বাঁচিয়া থাকে জীবনের কাজে,
কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা শুধু রহে চিরদিন—
তাহারি বাঁচাও তবে এ সবার মাঝে।

বিধবা সাবিত্রী হও বাঁচাও পতিরে,
পুত্র কর মৃত্যু হতে পিতৃদেবে ত্রাণ।
বন্ধু সখা যত আছ সুকর্ম্ম-সাধনে
কর্ম্মের মাঝারে কর নবজন্ম দান।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

একদিনের দেখা।

যখন প্রভাতকুসুম বাবুর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়, তখন ভাবি নাই, এই প্রথম দেখাই তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইবে।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। স্বর্গীয় দেবীবাবু আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার স্নেহ স্মরণ করিয়াই তদীয় একমাত্র পুত্রের সহিত পরিচিত হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। প্রভাতকুসুম অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, সে অবস্থায় তাহার যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম, পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার কল্পনা শুধু কল্পনাই মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

নব্যভারত আফিসে যাইয়া দেখিলাম, যে চেয়ারখানাতে দেবীবাবু বসিয়া কাজ করিতেন, সেইখানে একটী সাদাসিধে ছাঁচের, সৌম্যমূর্ত্তি যুবক, এবং অদূরে চৌকির উপর একটী প্রৌঢ় ভদ্র লোক বসিয়া আছেন।

প্রভাতবাবু বাসায় আছেন কি ? জিজ্ঞাসা করা মাত্র প্রৌঢ় ভদ্রলোকটা তাহার নিকটবর্ত্তী লোকটীকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনিই প্রভাতকুসুম। প্রভাতকুসুমকে দেখিয়া বুঝিলাম, স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্নের আশীর্ব্বাদ পুত্রকে কবচস্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এমন কি বিলাতের জলবায়ুও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। সত্য সত্যই আমি একটুও বিস্মিত হইলাম।

আমি তাহার স্নেহভাজন ছিলাম, সম্প্রতি আমার একমাত্র কন্যা "মালিকা" তাঁহাদের কুলের কুলবধূ হইয়াছে শুনিয়া তিনি যেন এক মুহূর্ত্তেই আমাকে নিতান্ত আপনজন মনে করিয়া ফেলিলেন। "নব্য ভারত" সম্পর্কে অনেক কথা হইল। নিজেই বলিতে লাগিলেন "আর্থিক হিসাবে "নব্য ভারত" দ্বারা আমি বিশেষ লাভবান নই। তবে মনে করি বাবা যদি একটা অক্ষম পঙ্গু ছেলে রাখিয়া যাইতেন তাহার ভারও আমাকে বহন করিতে হইত। নব্য ভারতকে আমার ভাইটীর ন্যায় যথাসাধ্য যত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। পরলোকগত পিতার কীর্ত্তিস্তম্ভ অটুট রাখিতে ভক্তিমান পুত্রের আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

প্রভাত বাবু "নব্যভারতের" বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে উহা স্বর্গগত মহাপুরুষ দেবীপ্রসন্নের আদর্শ নয়। Plain living and high thinking এই আদর্শ নিয়াই নব্যভারত এত দিন তাহার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন "বাবার শক্তি আমি কোথায় পাইব ? তাহার নামে যাহা হইত আমার শত চেষ্টায়ও তাহা হইবার নয়। তাই আজ কালের রুচি অনুযায়ী পত্রিকার কাগজ একটুকু ভাল করা এবং গঠনটি একটুকু সুন্দর করা আমার অভিপ্রায়। তবে গল্প বা ছবি দ্বারা কখনও নব্য ভারতের অঙ্গ প্লাবিত দেখিবেন না আমি নব্যভারতের পূর্ব্ব আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতেই চেষ্টা করিব। নব্যভারতে এমন প্রবন্ধ ছাপাইব না, যাহা অর্দ্ধনিদ্রিতও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পড়া যায়, পিতার আদর্শ রক্ষা করিতে পুত্রকে যত্নবান দেখিয়া সুখী হইলাম।

প্রভাত বাবু তাহার স্বর্গীয় পিতার প্রতি কতকটা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মনে মনে পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার আর একটী কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবী বাবুর শ্রাদ্ধদিনে নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে কোন কোন লোককে দেবী বাবুর ছবি দেওয়া হইয়াছিল। ছবি অনেক ছিল, তবু সকলকে কেন ছবি দেওয়া হইল না, কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রভাত বাবু বলিয়াছিলেন, "বাবার ছবি আমার প্রাণের জিনিষ, উহা লুচি মণ্ডার ন্যায় অযাচিতভাবে দিবার জিনিস নয়। যদি কেহ অবহেলা করিয়া ছবি ফেলিয়া যান তবে প্রাণে বড় আঘাত দিবে। ছবি অনেক আছে যাঁহারা আগ্রহ করিয়া ছবি নিবেন, তাঁহারাই নিতে পারেন। না চাইতে এসব জিনিষ দেওয়াকে আমি মনে করি "Parading Sorrows" এ ক্ষেত্রে আমি তাহা পারি না।"

একদিনের পরিচয়েই যাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না তাঁহার পরিজনবর্গকে সান্ত্বনার কথা আর কি বলিব ? ভগবানের মঙ্গলময় বিধান আমাদের বুঝিবার

সাধ্য নাই। কর্ম্মী প্রভাত কুসুমকে হয়ত তিনি অধিকতর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। অন্ধ আমরা না বুঝিতে পারিয়া তাহার জন্য শোকাকুল। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র অক্লান্ত মনে দেশের কাজ করিয়া, পিতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের শোকে সান্ত্বনা।

শ্রীঅদ্ধেন্দু রঞ্জন ঘোষ।

শোকে।

দাদা চলে গিয়েছেন আজও ঘুরে ফিরে শুধুই মনে হচ্ছে, এ কেমনে হ'ল! এ কি হ'ল। এমন লোহের মত দৃঢ় শরীর, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, এমন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম-পটু বজ্রকঠোর দেহ, কেমন করিয়া মাত্র আট নয় দিনের জ্বরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল। আজও যেন এ কিছুতেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছি না!। আশঙ্কার কারণ আছে, তা শুনেছিলাম। একটু একটু বুঝেও ছিলাম, তবুত মন একবার ও বল্‌ছিল না যে এত শীঘ্র দাদা তাঁর সোনার সংসার ফেলে চলে যাবেন। এতশীঘ্র তাঁর এত সাধের আয়োজন শেষ হয়ে যাবে।

নূতন ক'রে, স্বাধীন ভাবে যে আদর্শ জীবন যাপন করিবার আয়োজন কর্‌ছিলেন, সে জীবন নাটকের একটি অঙ্ক এমন কি একটি গর্ভাঙ্কও অভিনয় কর্‌বার পূর্ব্বেই যে কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির নির্ম্মম বিধানে অকস্মাৎ যবনিকা পতিত হইবে, কে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল। কত সাধ করিয়া, কি নিপুণতার সহিত, কি ই বা ক্ষিপ্রতার সহিত বাড়ী ঘর দুয়ার সব নূতন করে, নিজের পছন্দ মত তৈয়ারী করাইয়া ছিলেন। হায়, সে বাড়ীতে দুদিন ও বাস করিয়া যাইতে পারিলেন না। হঠাৎ যেন একটা ভূমিকম্পে সব চুরমার করে দিয়ে গেল!

কি বুক ভরা আশাই তাঁর ছিল। কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই না তিনি চলিয়া গেলেন। বাড়ীখানাকে মনের মত করিয়া সাজাইবেন, খোকাকে Laboratory (রসায়ন পরীক্ষা আগার) করিয়া দিবেন, খুকু খোকার এখানকার পড়া শেষ হলে সকলকে নিয়ে একবার বিলাত যাবেন, দেশের জন্য কত খাটিবেন, নব্যভারতকে আরও কত সুন্দর করিয়া চালাইবেন, এমন কত আশাই তাঁর ছিল। এত কাজ এত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া তিনি কেমন করিয়া চলিয়া গেলেন! তাঁর ত এখনও যাবার সময় হয়েছিলনা। তিনিও ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন না! তবে এ কেমন করে হ'ল! I want to live, I want to live রোগ-শয্যায় এ কথা কতবারই না বলেছেন। শনিবার সকালেও খোকাকে (প্রসূনকে) বলেছেন, 'Save father, that's all" যতই সেই সব কথা মনে পড়ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে, এত আশা, এত সাধ, এত আকাঙ্ক্ষা ওঃ, সকলের কি অপূর্ব্ব পরিনির্ব্বাণ!

১৯শে আগষ্ট শুক্রবার মধ্য রাত্রে জ্বর হইল। পর দিন সকালেই জ্বর বেশী। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। সোমবার রাত্রিতে ডাক্তারগণ সন্দেহ করিলেন, বোধহয় একটু নিউমোনিয়ার আশঙ্কা আছে। মঙ্গলবার আর একজন ডাক্তারকে আনা হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বুধবার দিন পেটটা খারাপ হইল। সকলেই ভয় পাইলাম। কিন্তু দাদা বলিলেন, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? বৌদিকে একটুকু অনুযোগ ও করিলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার বেশ ভালই দেখা গেল। সকলেই মনে করিলাম, বিপদ কাটিয়া গেল। দাদাও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। নব্যভারতের কত ফর্ম্মা ছাপা হইল, প্রুফ দেখা হল কি না, ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ খবর নিতে লাগিলেন!

এত সাধের নব্যভারত! রোগশয্যায়, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও নব্যভারত যেন ঠিক সময়ে বাহির হয় বার বার একথা বলেছেন। শনিবার দুপুরে পর্য্যন্ত আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমার বৌদি বুঝি প্রুফ্ দেখ্ছেন?" হায়, নব্যভারতের বন্ধন, প্রাণ-প্রিয় পত্নী ও ছেলে মেয়ের স্নেহের বন্ধন বা সমস্ত ভারতের সেবার বন্ধন, কিছুতেই দাদাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না!!

শুক্রবার শেষ রাত্রি হইতে রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিল। তখনই দুইজন ডাক্তার আসিলেন; পরদিন আরো কয়জন ডাক্তার একত্র হইলেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা যত্ন চেষ্টার এবং শুশ্রূষাকারীগণের শুশ্রূষার কিছুরই ত্রুটি হইল না। কিন্তু, যাকে ভগবান ডেকে নেন, তাকে কোন্ পার্থিব শক্তি ধরে রাখ্‌তে পারে? অসীমের ডাক যখন আস্‌ল, তখন কোন ও সসীম শক্তি তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌ল না। কিছুতেই কিছু হইল না। ১২ই ভাদ্র রবিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় আমাদের কতশত জনের দাদা, সকল চিকিৎসা সকল সেবা, সকল যত্ন, সকল আদর উপেক্ষা করিয়া তাঁর কত আদরের, কত যত্নের, কত স্নেহের পত্নী, পুত্রদ্বয়ও কন্যাদ্বয়কে অকূল শোকের পাথারে ভাসাইয়া মধ্যাহ্ন-রবির প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন প্রভাতের কুসুমটিরই মত দেবতার পায় অর্ঘ্য হইয়া ঝরিয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালিন মুখ খানা তাঁহার চির অভ্যস্ত হাসিতে মাধুর্য্য-মণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল! যখন পত্নী পুত্র আত্মীয় অনাত্মীয়গণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ সেই গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছিল, তখনও সেই চির শান্ত চিরধীর মুখ খানায় সেই চিরদিনের স্নেহ মাখান মধুর হাসিটি ভক্তকবি তুলসী দাসের অপূর্ব্ব দোঁহাটাই মনে জাগাইয়া দিতেছিল—

তুলসী যব্ তোম্ জগ্‌মে আয়া জগ্ হাসে তোম্ রোয়,
এসা করনা কর্ যাও ভাই, তোম্ হাসে জগ্ রোয়।

সত্যিই আমাদের দাদা এই ৪৪ বৎসরের মধ্যে এত কাজই করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তেই চলে গিয়েছেন, আর আমরা সব তাঁহার জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছি!

দাদা চিরদিনই খুব ধীর এবং স্থির ছিলেন। রোগশয্যায় রোগের নিদারুণ ক্লেশেও তাঁর সেই ধৈর্য্যের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কেমন শান্ত ও ধীর ভাবে তিনি সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্তও বাঁচবেন বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শুক্রবার শেষ

রাত্রে আমায় বল্লেন, "Harendra I am not going to live." আমি বল্লাম, "কেন ও কথা বলছেন?" অমনি কথাটি ঘুরিয়ে বল্লেন, "না, ও কিছু না।" শনিবার সকালে হাতমুখ ধুয়ে, নিজেই হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন। "ভগবান, আর ত সহ্য করতে পারি না, সব শেষ করে দাও, আমার রোগ সারিয়ে দাও, আমায় ভাল করে দাও।" শনিবার রাত ৩টা পর্য্যন্তও বেশ জ্ঞান ছিল। তার পর হইতে একটু একটু করিয়া জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। রবিবার সকালেও খুকুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Baby have you finished your French lesson" কি আগ্রহের ও যত্নের সহিতই তিনি খুকুকে পড়াইতেন এবং তার পড়াশোনায় উৎসাহের কথা বলিয়া কতই না তার প্রশংসা করিতেন। হায়, তেমন করিয়া ত আর কেউ তাকে পড়াইতে পারিবে না।

দেশের ইংরেজী বাঙ্গলা সকল পত্রিকাতেই তাঁর কর্ম্মজীবনের অনেক কথা লিখিয়াছে। সুতরাং আমি সেসব কথা লিখিতে ইচ্ছা করি না। আমি শুধু দাদা কোথায় বড় ছিলেন, তাই বলিতে চাই। সব হয়ত বলিতে পারিব না, তবু যতটা পারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব।

দাদাকে আমি প্রথম চিনি বা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাই "কেশব একাডেমীর" স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক মন্মথনাথ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর দিনে। কি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সেই মৃতদেহের বেশাদি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং কেমন অম্লান বদনে মৃতদেহ বহন করিয়া চলিলেন। আমার স্মরণ হয় না, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও ব্যারিষ্টার বা বিলাত ফেরত কোনও ব্যক্তিকে নিজের বিশেষ নিকট আত্মীয় ব্যতীত অপর কাহারও মৃতদেহ বহন করিতে দেখিয়াছি।

এই দুর্দ্দিন দুঃসময় কালে হা হুতাশ করিবার লোক অনেকই দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বুক দিয়া পরের বাড়ীর মৃতদেহের শেষ কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে অপর কাউকে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। আমরা জানি এই কার্য্যে অনেক সময়েই দাদাকে নিজের পকেট হইতে বেশ দুটাকা খরচ করিতে হইত। দাদার মত শ্মশান-বান্ধব এ জীবনে আর দেখি নাই।

আর আজ মনে পড়ে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রামে শোচনীয় মৃত্যুর কথা। সেই দারুণ শীতের রাত্রিতে ভবানীপুরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সেই ট্রামপিষ্ট দেহের ধীরভাবে যথাযথ বন্দোবস্ত করার কথা। পর দিন দাদার এক আত্মীয় দাদার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "সাবাস্ বেটা, ছুটো মুখের আপশোষ সকলেই করতে পারে, কিন্তু বুক দিয়া পকেটের পয়সা খরচ করিয়া পরের উপকার করতে বেশী লোক পারে না। বেঁচে থাক্ লোকের উপকার হবে।" হায়! সে সব প্রাণের আশীর্ব্বাদে ও দাদাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না!! এরূপ যখন যেখানে মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, দাদাকে সেখানে সেবার জন্য উপস্থিত দেখিয়াছি। অহঙ্কার বলে একটা জিনিষ দাদার মধ্যে কখনও দেখি নাই। তাঁর মনটা খুবই বড় ছিল, পরের দুঃখের বোঝা তিনি সর্ব্বদাই ঘাড় পাতিয়া লইতেন।

৺ দেবী বাবুর মত দাদাও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। ১৯০৬ সনে যখন কলিকাতায় বির্জ্জিতলার মোড়ে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী ও কংগ্রেস হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার মধ্যে একজন কর্ম্মচারী ছিলাম। তখন দেখিয়াছি, দাদার কাজ করিবার শক্তি। একমাস প্রায় বাড়ীতেই আসিলেন না। সারাদিন রাত না খেয়ে দেয়ে তিনি কাজ করতে পারতেন। আর কি-ই বা ছিল তাঁর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা। তিনি একজন Assistant Secretary ছিলেন। কিন্তু তিনি যা পরিশ্রম করতেন, তার অৰ্দ্ধেকও অন্যে করতেন না। গতবারে কলিকাতায় যে Special কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তখন ও ১৫।১৬ দিন দাদা কতই না খাটিয়াছেন। এই ১৫।১৬ দিন বাড়ীতে আসেন নাই, এমন কি প্রতিদিন আহার পর্য্যন্ত করিতে সময় পান নাই। যে কাজ যখন তিনি করিতেন একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়ে করতেন, কি সুন্দরই ছিল, তার বন্দোবস্ত, কি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর সুরুচিজ্ঞান, আর কেমন ধীর স্থির ভাবে কাজটি তিনি করে ফেলতেন।

অনেককেই দেখি কাজ করিতে গেলে হাক্ ডাক দিয়া সোরগোল করিয়া তুলেন। আর যতটা কাজ করেন, হৈচৈ করেন, তার অনেক গুণ বেশী। কিন্তু দাদার কাজে তা হবার যো ছিল না। দাদা যে কাজ করছেন, খুব কম লোকই তা টের পাইত। সমস্ত কাজের plan-টি এমন সুন্দর ভাবে তাঁর মাথার মধ্যে থাকৃত যে ঠিক ঠিক সময়ে আপনি সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে দেখা যাইত। মনে হইত যেন সব কলে করা হয়ে যাচ্ছে।

সব কাজেই তাঁর খুব সুন্দর শৃঙ্খলা ছিল। আধাখেচ্‌ড়া করিয়া কাজ তিনি আদৌ করিতেন না। আর ছুটোপুটি জিনিষটা তিনি আদৌ ভালবাসতেন না। সেইজন্য কখনও কোন কাজে তাঁকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। সর্ব্বদাই মনে হইত তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই সব ভেবে চিন্তে রেখেছেন। দাদার পছন্দটি ছিল একেবারে নিখুঁত। ঠিক যে জিনিষটি যেমন হইলে যেখানে মানায়, তার একচুল ও ব্যতিক্রম হইতে পারিত না

দাদার আর একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। আমার যতটা মনে হয় ইহা তাঁহার চিন্তাশীলতারই পরিচায়ক। তবে ইহা যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানচর্চ্চার ফল, তাহাও সুনিশ্চিত। যখন যে কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই দাদার অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা কতদিন চমৎকৃত হইয়াছি। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা যখন উঠিত, তখন তিনি এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন যে, নূতনলোক শুনিলে তাঁহাকে ডাক্তার মনে না করিয়া পারিত না। বালীর শ্রদ্ধেয় মথুর বাবুর পুত্র সুধাংশুর Gallstone operation এর সময় ডাঃ ৺সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দাদাকে একজন L. M S বলে মনে করেছিলেন। এরূপ Photography সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা ছিল। সবজিনিষই তিনি খুব সুন্দররূপে তন্নতন্ন করিয়া দেখিতেন। ময়রাগণ বাসি লুচি ইত্যাদি দিয়া কি করে, চপের দোকানে বাসি মাংসের কিরূপে ব্যবহার হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট খবর রাখিতেন। "seeds oils" সম্বন্ধে যে পুস্তিকা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে জানা যায় তিনি ঐসব বিষয়েরও কত খবর রাখিতেন। কংগ্রেসের কাজের সময় আমাদের বলিয়াছেন, দেখ এই লোকগুলি রাত ৩টার পর কাজ করে; তখন ইহাদের অন্যকাজ থাকে না, তাই অল্প মজুরীতে পাওয়া যায়। এইরূপে

তিনি বিবিধ বিভাগে বিবিধ রকমের খবর রাখিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কথা অনেক দিন তাঁর সঙ্গে হইয়াছে। সর্ব্বদাই দেখিতাম তিনি যেন সবই পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছেন।

আজকাল দাদার ধর্ম্মভাব ও বেশ পারস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দেবালয়ে যে দিন উপাসনা করিবার কথা থাকিত, সেদিন পূর্ব্ব হইতে কি নিষ্ঠার সহিত সব কাজ করিতেন এবং কেমন ব্যাকুলতা লইয়া উপাসনা করিতে যাইতেন!

কি আমুদে লোকই তিনি ছিলেন। যেখানে যখন থাকিতেন, সকলকে মাতাইয়া রাখিতেন। যাহারা তাঁর সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান নাই, বা পাইলেও মিশেন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দাদার সম্বন্ধে খুব উঁচু ভাব পোষণ নাও করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা মিশিয়াছেন, তাহারা জানেন কি সোণার মানুষ ছিলেন তিনি, আর কি সরল ও উদার প্রাণ ছিল তাঁহারা।

রন্ধন কার্য্যে দাদার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমিষ নিরামিষ কত রকমের রান্নাই যে তিনি জানিতেন, তার সংখ্যা করা যায় না। কত রান্ধুনে বামুনই দাদার নিকট রন্ধন কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়াছে। সেব কার্য্যের বন্দোবস্ত করতেন তিনি অতি সুন্দর রূপে। অমুকের মেয়ের বিবাহ, অমুকের ছেলের বৌভাত, অমুকের পিতৃশ্রাদ্ধ, অমুকের মাতৃশ্রাদ্ধ, এসব বন্দোবস্তের ভার প্রায়ই পাড়ত দাদার ঘাড়ে। আজকাল ত প্রায় ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বত্রই এসব কাজে দাদার পরামর্শ বা বন্দোবস্ত ছিল। বড় ছোট ধনী দরিদ্র যিনিই দাদাকে ডাকৃতেন না কেন, তিনি অম্লান বদনে তাঁর বাড়ীতে যাইতেন এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া লোকজনকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া আসিতেন। ইহাতে দাদার মান, বা অহঙ্কার আদৌ ছিল না। সময় সময় এজন্য নিজের আত্মীয় স্বজনের অনুযোগ ও সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি লোকের সেবা করিবার সুযোগ পাইলে কখনও তাহা হইতে পশ্চাদ পদ হয়েন নাই। কত পিতা কত বিধবা মাতাকে আমরা দেখিয়াছি, দাদার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিয়াছেন, "প্রভাত, এই আমি দিতে পার্‌বো, ইহা দিয়ে যেমন করে হয়, তুমি কাজটা সম্পন্ন করে দাও।" দাদার মাথায় বড়, ছোট, মাঝারি, আড়ম্বর পূর্ণ, অনাড়ম্বর, কত plan ই ছিল, অল্প টাকায় কি করে সব গুছিয়ে করতে হয়, তা তিনি যেমন জানতেন, এমন আর কাউকে দেখিনি। এসব কাজেও অনেক সময় তাঁকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করতে হত। দাদার ইহাতে position এর হানি হতে পারে, এমন কেহ বলিলে, তিনি হাসিতেন ও বলিতেন, "তা হউক, ওদের কত উপকার হয় তা ত তোমরা ভাবতে পার না?" এ কতবড় মনের পরিচায়ক। যে সকল বামুন দাদার সহিত কাজ করিত, তারা তাঁকে কি না ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত। সেদিন ও কুঞ্জঠাকুর দাদার কথা বলিতে বলিতে কেমন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিল। বেচারী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদছিল, আর বলছিল, "এমন দাদা আর পাবোনা।" ইংরেজীতে একটা কথা পড়িয়া ছিলাম "A man is best known by his servants" ভৃত্যগণ তাঁকে যত জানে এমন আর কেহ জানিতে পারে না।" দাদার ভৃত্যবর্গ দাদার জন্য কাঁদিয়াই আকুল। কাঙ্গালীকে (ভৃত্য) দাদা আদর করিয়া ডাকিতেন 'কাঙ্গাল!' মৃত্যুর পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যার সময় ও বলেছেন "কাঙ্গাল, আমার পা টা আস্তে আস্তে টিপে দে

ত বাপ, কাল খুব ভোরে ঘোড়াকে দানা দেবার আগেই একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি।" বেচারা কাঙ্গালী শ্মশানে পর্য্যন্ত কি কান্নাটাই কেঁদেছে, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিরও কি কান্না! সত্যই মনে হচ্ছে, "তোম্ হাসে, জাগ্ রোয়।"

সচরাচর দেখা যায় যাহারা বাহিরের কাজ বেশী করেন, তাহারা নিজেদের গৃহস্থালীর প্রতি অনেকটা উদাসীন থাকেন। কিন্তু দাদা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বাড়ীর প্রত্যেকটি কার্য্য তিনি নিজে দেখ্‌তেন। ছেলে মেয়েদের কি যত্নই না তিনি কর্‌তেন! সর্ব্বোপরি যত্ন করিতেন তাঁর প্রাণ-প্রিয়া পত্নীর। কি ভালবাসাটাই যে দাদা ইঁহাকে বাস্‌তেন, তা দেখে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম্। রোগশয্যায় ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁকে ডাক্‌তেন। তাঁর একটু কাতরতা যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। হায়। আজ তাঁর আমরণ দুর্ব্বিসহ ক্লেশের কথা তিনি কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন, সেই স্নেহময় প্রাণে ত কোন ও দিন এতটুকু নিঠুরতা দেখি নাই!

লোকজনকে খাওয়াইতে যে তিনি কি ভাল বাসিতেন! এই খাওয়ানকে তিনি একটা বড় তপস্যা মনে করিতেন। কতদিন বলিয়াছেন, "দেখ, ১১ই মাঘ লোকজন উপাসনার জন্য আসে; তাঁরা উপাসনা করেন, আর আমি তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ায় ব্যবস্থা করি; এতে কি আর আমার উপাসনা হয় না?" সেদিনও আমায় ঠাট্টা করে বলেছেন, কি হে, আজকাল আর খাওয়াচ্ছ দাওয়াচ্ছ না যে।" তৃপ্তিমত লোককে খাওয়াইয়া যে তাঁর কি তৃপ্তিই হইত! আগে নানা অসুবিধায় ইচ্ছামত বন্ধু বান্ধবদের আনিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই এবারে বাড়ীটা ঠিব ঠাক হলে ইচ্ছামত দুদশ জন বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইবেন, একথা কতদিনই বলেছেন। হায়, সব শেষ। সব শেষ। Man proposes God disposes (মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর) ওঃ, কি নিয়ম সত্য!!!

আজ বুক ভরা শোক লইয়া শুধু এই বলিতে ইচ্ছা হয়, "হে বিশ্বের বিধাতা, কি নির্ম্মম তোমার বিধান! কি কঠোর তোমার বিধি!! কি মর্ম্মন্তুদ তোমার কার্য্যাবলী!!!

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র বসু।

৺প্রভাতকুসুম রায়।

যখন কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, মহাত্মা দেবীপ্রসন্নের সুযোগ্য একমাত্র পুত্র প্রভাত কুসুম আর ইহধামে নাই ; অল্প কয়েক দিন হয়, স্নেহাধার জনক জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য মানবের অজ্ঞাত প্রদেশে ছুটিয়াছেন। তখন যে কিরূপ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা অনুভব করাই সম্ভব, ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। যাহার দ্বারা স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্নের কীর্ত্তি কলাপ সুরক্ষিত ও আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবার আশা পোষণ করা হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার তিরোধানে দেবীবাবুর অনুরাগী জনের কি প্রকার নিরাশা ও নিরানন্দ উদ্ভূত হওয়া স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রভাতকুসুম, প্রভাত জীবন অতিক্রম করিয়া যৌবন মধ্যাহ্নেই ঝরিয়া পড়িলেন, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কত আশা, কত ভরসা, কত উচ্চ কল্পনা, কত অনুষ্ঠান, কর্ম্মী প্রভাত কুসুমের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে মিলাইয়া গেল, লোক-লোচনের আর গোচরীভূত হইল না। বলিতে পারি না, ইহার অভাবে বঙ্গের কতটা ক্ষতি হইল,— ক্ষতি যে হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। এই মাত্র কর্ম্ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সুবাস ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বন্ধু বান্ধবেরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিতেছিলেন ; কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে অকালেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলেন।

প্রভাতকুসুমের জীবন ঘটনা বহুল না হইলেও তাঁহার জীবনে আমরা যে সমস্ত সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তিনি পিতার স্থান পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও পিতৃ কীর্ত্তি রক্ষায় সমধিক উৎসাহী ও যত্নবান-ছিলেন। দেবীবাবুর মৃত্যুর পরে সুসম্পাদিত "নব্যভারত' যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নব্যভারতকে প্রবন্ধ-গৌরবে মণ্ডিত করিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

প্রভাতকুসুম স্পষ্টভাষী ও স্বাধীন চেতা ছিলেন। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আত্মীয় স্বজন প্রেমাস্পদ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি বর্গের অন্যায় কার্য্যের বা অসঙ্গত উক্তির অন্ধভাবে সমর্থন করে। তিনি এশ্রেণীর লোক ছিলেন না। কতবার দেখিয়াছি, তাঁহার পূজনীয় জনকের কথারও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিনীত ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন—বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার শিষ্টাচার ও মধুর ব্যবহার উল্লেখ যোগ্য। দেবীপ্রসন্নবাবুর শ্রাদ্ধ দিবসে যখন আমরা তাঁহার ভবনে উপস্থিত ছিলাম, দেখিলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি কি ভাবে কিরূপ মধুর ও বিনয় মাখা ভাষায় অভ্যর্থনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধ-দিবসে তাঁহার হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! প্রভাতকুসুমের সে শ্রদ্ধা প্রকাশের স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

তিনি স্বদেশভক্ত ছিলেন। সুযোগ ঘটিলে তিনি সাধ্যানুসারে স্বদেশের কাজ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল। যখন যে কর্ম্মের ভার তিনি পাইয়াছেন, যোগ্যতার সহিত তাহা নিষ্পন্ন করিয়া কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিয়াছেন।

সেবাধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল কিন্তু তাহা দেখাইবার সুযোগ ঘটিল না।

স্নেহে, মমতায়, প্রেমে ও ভক্তিতে তাঁহার অন্তর শোভিত ছিল। মনুষ্যোচিত গুণগ্রামের তাঁহাতে অভাব ছিল না। অৰ্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুম জানিনা কোন কর্ম্মফলে, অতৃপ্ত বাসনা লইয়া অসময়ে অনিচ্ছায় প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহাস্পদ সন্তান ও বন্ধুবান্ধবগণকে অশ্রুধারায় প্লাবিত ও মর্ম্ম বেদনায় পীড়িত করিয়া বৃন্তচ্যুত হইল।

ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষিত হউক। তাঁহার স্মৃতি আমাদের নিকট মধুর হইয়া থাকুক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

শ্রদ্ধায় স্মরণ।

আনন্দ-আশ্রম আজ নিরানন্দে পূর্ণ। দেখিতে দেখিতে বৎসরের মধ্যে পিতা পুত্র দুইই চলিয়া গেলেন। আনন্দ-আশ্রমে যাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া ইহারা চলিয়া গেলেন তাহারাই যে শুধু আজ শোকাকুল তাহা নহে, যাহারা একবার আনন্দ-আশ্রমের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারাও আজ শোকে ম্রিয়মাণ। আনন্দাশ্রমে পদার্পণ করিয়া কে মনে করিয়াছেন তিনি ঐ পরিবারের একজন নন? পরকে আপন করিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিতে আনন্দাশ্রমের সৃষ্টি। পিতা এই আশ্রমকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন এবং পুত্র ও এই আশ্রমের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আনন্দ-আশ্রমের পবিত্র প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র পুত্রের হস্তে আশ্রমের ভার রাখিয়া গত বছর এই সময় ৬৯ বৎসর বয়সে পিতা দেবীপ্রসন্ন দেবগৃহে দেহ রক্ষা করিলেন। তাহার শোক আত্মীয় স্বজনগণ এবং দেশ এখনও ভুলিতে পারে নাই। এত লোককে পিতার মৃত্যুতে শোকাতুর দেখিয়া পুত্র কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন এবং পিতার কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। না জানি অমরধামে এই অল্পকাল মধ্যে পিতা আবার কোন আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তাহার উপযুক্ত সেবকের প্রয়োজন হওয়ায় প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত, আপন পুত্রকে আহ্বান করিলেন। বিধাতার ইঙ্গিতনিহিত সেই আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া, এ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতঃ দেবীসমা ভার্য্যা, সরল অকুটন্ত পুষ্পসম পুত্র কন্যাগণ এবং প্রেমে মুগ্ধ আত্মীয়গণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া কর্ম্মী প্রভাতকুসুম অমর ধামে ছুটিয়া গেলেন। যাহারা প্রাণসম প্রিয় ছিল তাহাদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না। এ সংসারের কর্ত্তব্য ও মায়ার বন্ধন তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না! হায়! আজ তাঁহার পরিবারস্থ সকলের কি অবস্থা! একবার ভাবিতে গেলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! ভগবানের

ব্যবস্থা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহারা এ সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী হইতে চলিয়া যান তাহাদের জন্য শোক করিবার বিশেষ কারণ থাকে না, কিন্তু যাহারা জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে এ সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া হঠাৎ সব মায়া ডোর ছিন্ন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান তাহাদের বিয়োগজনিত দুঃখ আমরা সহজে ভুলিতে পারিনা। যাহাদিগকে তিনি সহোদর জ্ঞানে স্নেহ করিতেন আমি তাহাদের মধ্যে একজন, তাই এই নিদারুণ সংবাদে বজ্রাহত হইয়াছি। আমার ন্যায় অনেকেই তাঁহার নিকট অকৃত্রিম ভাতৃস্নেহ পাইয়াছেন, এই শোক সংবাদে তাঁহাদেরও অশ্রু ঝরিতেছে।

অনুমান ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, এবং পরিচয় হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্টতা হয়। আস্তে আস্তে তাহার এত স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছিলাম যে আমি বুঝিতে পারিতাম তিনি আমাকে তাহার ছোট সহোদরের স্থান দিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতাম এবং ভালবাসিতাম। এই ভালবাসাতে বড়ই আনন্দ পাইতাম। তিনি অতি স্নেহশীল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লোককে আপন করিয়া নিতেন। তাঁহার অমায়িকতা ও স্নেহ পরায়ণতা দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়াছি। পুত্র কন্যাগণকে তিনি কিরূপ ভাল বাসিতেন, যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা শুধু অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্তানগণসহ অনেক সময় একপালায় আহার করিতে দেখিয়াছি। সন্তানগণও পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং কখনও অবাধ্য হয় নাই। সন্তানগণের শিক্ষার প্রশংসা অনেকেই করিতেন। সন্তানগণকে ডাকিবার সময় 'বাবা' 'মা' শব্দ সর্ব্বদা তিনি ব্যবহার করিতেন। সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার মতের উপযুক্ত শ্রদ্ধা দিতেন। প্রায় সকল কার্য্যেই বৌদির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি জানিতেন বৌদির ভিতরে কি শক্তি আছে এবং তাঁহার হৃদয় খানি কত বড়।

রোগীর শুশ্রূষায় তাহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়াছি। হৃদয় যেমন সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল তেমন রোগীর সেবায় তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বহুলোকের রোগ শয্যার পার্শ্বে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আনন্দাশ্রমে কেহ রুগ্ন হইয়া আশ্রয় লইলে তাহার শুশ্রূষা নিজেই করিয়াছেন। পণ্ডিত রসিকলাল রায় ও নাটকের ব্যারিষ্টার ৺সুকুমার রায়ের রোগ শয্যায় তিনি কিরূপ শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা আজ ও আমার স্মরণ হয়। কাহারও কোন বিপদের সংবাদ পাইলেই ছুটিয়া যাইতেন, অনেক বিপন্নকে আনন্দাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছেন। একবার যাহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাহারা যে ঐ পরিবারের লোক নয় পরে কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। বাড়ীতে সকলের এক প্রকার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় বাড়ীতে যাহারা থাকিতেন তাহাদের সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিতেন। নিজে বাজারে গিয়া প্রায়ই মাছ তরকারি কিনিয়া আনিতেন। যাহাতে বাড়ীর সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

দেশসেবা ও জনসেবায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দেশহিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভিতর লিপ্ত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তাহা করিয়া যাইতেছিলেন। কোন কার্য্য হাতে গ্রহণ করিলে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন এবং শৃঙ্খলার সহিত তাহা সমাপন করিতেন। কলিকাতা

কংগ্রেসের গত দুই অধিবেশনের বন্দোবস্তের কৃতকার্য্যতা তাহার একান্ত পরিশ্রমের ফল। মটরগাড়ীসমিতির সভাপতি রূপে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন এবং তাহার স্থির বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা চালকদিগের অনেক দুঃখ দূর করিয়াছেন। শ্রমজীবীদিগের তিনি সহায় ছিলেন। ১৯০৬ সনে Industrial Exhibition, এর সম্পাদক রূপে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েদিদিগের সাহায্য সমিতির (Prisoner's aid society) সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়া দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কয়েদিগণকে অনেক সময় রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন। তিনি ভাল রান্না করিতে জানিতেন। এজন্য অনেক সামাজিক নিমন্ত্রণে তাহাকে খুব খাটিতে হইত, কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না। পরিশ্রম করিতেও কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। জনসভার সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ফরিদপুরের সুহৃদসভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং সহঃ সম্পাদক ভাবে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণের সময় পারিতোষিক ঠিক করিতে সমস্ত রাত্র একভাবে বসিয়া কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। আমি তাহার সহিত ৮।৯ বৎসর সুহৃদসভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে কাজ করিয়াছি। সেখানেও তাহার সুবিবেচনা ও স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। ফরিদপুরের উন্নতি অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ফরিদপুরবাসীগণের Lantern lecture দ্বারা উপকার করিবার একটি প্রস্তাব করেন। সুহৃদ-সভা এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। সুহৃদ-সভার পারিতোষিক বিতরণের জন্য একবার আমরা একসঙ্গে ফরিদপুর গিয়াছিলাম। অনুমান ১২ বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন রিপন কলেজ গৃহে ফরিদপুরবাসীগণের একটি সম্মিলন হয়। তিনি এই সম্মিলনে খুব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাহিরের কোন আড়ম্বর ছিল না। সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। যে কেহ যে কোন সময়ে তাহার সহিত দেখা করিতে পারিতেন। তাঁহার ন্যায় একজন হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারকে ঐরূপ ভাবে সকলের সহিত মিশিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত। এইরূপ দেশীয় ভাব তাঁহার ন্যায় পদস্থ অন্য কোন বাঙ্গালীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহার খ্যাতি ছিল, সরল ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা তিনি বাহিরের লোকের যেরূপ ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন সেরূপ সমব্যবসায়ীগণেরও প্রীতি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Bar Librarya সম্পাদকের কার্য্য উপর্য্যপরি ৫।৬ বৎসর করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। Justice Ghose সেদিন হাইকোর্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে—"A man of most untiring energy who entered into the joys and sorrows of every member of the Bar He had known him as Secretary of the Prisoners' aid society in which position his services were highly appreciated. He was one of the secretaries of the Calcutta Industrial Exhibition of 1906 and was mainly responsible for the success of that organisation. He was also one of the secretaries of the last two Indian National congress held in calcutta. In Industrial matters in which he

latterly took an interest his influence was always on the side of law, order and sobriety of judgment In his death not only had the profession lost a sincere friend but the public had lost a most capable citizen

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' চালাইবার ভার স্বহস্তে নিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যেই কাগজের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের উপকার হয় এইরূপ প্রবন্ধ দ্বারা কাগজ পূর্ণ করিবেন। এজন্য প্রবন্ধের জন্য অনেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে ধরিয়াছিলেন, এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক সময় আমার কথা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তাঁহার আদর্শমত কাগজ খানি চালাইতে পারিলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলিয়া গণ্য হইত। নব্যভারতের জন্য গত এক বৎসর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

তিনি খুব পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার আদেশ কখনও অবহেলা করিতে দেখি নাই। পিতার সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেও পিতার মত অনুসারে কার্য্য করিতেন। বহুলোকে পিতাকে ধরিয়া তাঁহাদ্বারা কাজ করাইয়া লইতেন। কোন এক সময় ভুল ধারণা করিয়া পিতা তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করিয়াছিলেন, তিনি নীরবে তাহা সহ্য করিয়াছেন। পিতার সহিত কখনও তর্ক করিতে দেখি নাই। পিতা তাঁহার মৃত্যুসময় বোধ হয় সে ভুল বুঝিয়াছিলেন! মনে হয় পুত্রকে তাহা জানাইবার জন্যই অমরধামে পুত্রকে ডাকিয়া লইলেন। পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অনুতাপের ভার দূর করিলেন।

গত ১৩১০ বৎসরের বিশেষ যোগে তাহার ভিতর যাহা দেখিয়াছি তাহার কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিলাম। মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত, তবু শোককে আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। আজ তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানগণের অশ্রু কে মুছাইবে? তাঁহারা যে অভাবে আজ অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা এ সংসারে আর পূরণ হইবে না। ভগবানকে নির্ভর করা ব্যতীত এ শোকে সান্ত্বনা নাই। বন্ধু বান্ধবগণের শোকাশ্রু তাহাদের অশ্রুর সহিত মিশিতেছে। এ শোকের সান্ত্বনা এই যে, দেশে নানাশ্রেণীর বহুলোক আজ তাঁহার জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার স্মৃতি বহুলোকের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। এই সকল হৃদয়ে তিনি বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। এখন তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি কামনা করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করিবার নাই, তিনি যে রাজ্যে গিয়াছেন সেখানে যেন নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন ভগবান তাহাই করুন, আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি তিনি গ্রহণ করুন, একদিন আসিবে যখন ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে এবং সেই অমরধামে সকলের মিলন হইবে, ভগবান এ বিশ্বাস দৃঢ় করুন।

বরিশাল। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সার্থকতা।

হেথা তব কর্ম্ম শেষ—সেথা প্রয়োজন,
তাই তব স্বর্গ হ'তে এল নিমন্ত্রণ।
চ'লেগেলে তুমি কর্ম্মী সে অপূর্ব্ব দেশে
তব নব কর্ম্মক্ষেত্রে, বিজয়ীর বেশে
গৌরব মুকুট পরি'—ওগো মহাপ্রাণ
বয়োবর্ষ নহে কভু জীবনের মান।
হয় তাহা নিরূপিত ধর্ম্মে কর্ম্মে দানে—
দেশের মঙ্গলে আর দশের কল্যাণে।
প্রভাতে ফুটিয়া ফুল ঝরিছে সন্ধ্যায়,
তার পরিচয় শুধু কর্ম্ম-মহিমায়!
তার সার্থকতা শুধু সৌরভ-সম্পদে,
তার সার্থকতা শুধু দেবতার পদে।
তেমতি অল্পায়ু তব সুন্দর জীবনে,
কি ঐশ্বর্য্য রেখে গেলে নীরবে গোপনে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

জলছবি।

মাটির বুকে, অল্প একটু খানি ঠাঁই জুড়ে পড়ে থাকে জলাশয়, যেন সকলের কাজে আসবার জন্যেই। তার নিজের যেন কিছুই নেই—অভাবও না, ইচ্ছেও না।

রোদের তাপে জল শুখিয়ে গিয়ে তার বুকের মাটি যখন ফেটে যায়, তখন তার জন্যে কাঁদে মানুষ। আবার বর্ষায় যখন তার কূল ছাপিয়ে যায়, তখন তার জন্যে আনন্দ করেও মানুষ।

বসন্ত দিনে, ঐ নিথর জলের বুকে রঙ্গিন ছায়া ফেলে, পাতা ভরা গাছের সারি ধীর বাতাসে দোল খেতে থাকে; দুপুর বেলার স্তব্ধতা ঘুচিয়ে দস্যি ছেলের দল, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অস্থির করে তুলতে চায়; তবু এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করেনা সে, যাতে মনে হ'তে পারে 'অনুভূতি' বলে একটা কিছু ওর আছে। এমন কি শান্ত সন্ধ্যায়, কর্ম্ম শ্রান্ত দেহ লতাটী ডুবিয়ে দিয়ে গ্রামের বধূটি যখন অবসাদ মেটায়, কিম্বা প্রিয় সখীর কানে কানে সব চেয়ে গোপন কথাটি বলে, বুকের নীচে কলসী রেখে, গভীর জলের দিকে এগিয়ে যায়—তখনও না! পায়ের ধাক্কা লেগে যে জলটুকু ছলকে ওঠে, সে যেন জলের শব্দ নয়; ঐ মেয়েটির রুদ্ধ হাসিরই প্রতিধ্বনি। সে থাকে স্তব্ধ। তার চার পাশের মাটির সীমানার মতই।

কিন্তু ওর অর্থ কি? রক্ত রাঙ্গা পাপ্‌ড়ি গুলি মেলে দিয়ে, নিবিড় কালো বুকের তল হ'তে ধীরে ধীরে ঐ যে বেরিয়ে এল! ও কোন বেদনার ভাষা? আর তারই পাশে ফুটে আছে শান্তি ভরা ও কার শুভ্র হাসির শ্বেত শতদল!

২

পাষাণ পুরীর প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনায় হিমানীর বুকে পাষাণের মতই অচল হয়ে অচেতনে ঘুমিয়েছিল নির্ঝরিণী। জমাট কুয়াসার আবরণ সরিয়ে দিয়ে রবির আলো, মোহন স্পর্শ খানি তার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিল।

পাখীর গানে আকাশ ভরে গেছে। সবুজ ওড়নার ভিতর হ'তে মুকুল গুলি তাদের অমলিন মুখ বাড়িয়ে দিল। দমকা হাওয়া নিঝরিণীর গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে তার কানে কানে কি বলে গেল কে জানে। চমকে উঠে, হাজার হাত উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, নিঝ'রিণী বল্‌ল চল্‌-চল্‌-চল্‌।

মাটি বুক পেতে তাকে ধরতে গিয়ে বল্‌ল—ওকি? কোথা যাও? ওগো তটিনী, একটু দাঁড়াও।

মাটিকে দুপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তটিনী হেসে উঠ্‌ল খল্‌-খল্‌-খল্‌। তার হাসির তালে তালে শত শত উপল খণ্ড নাচ্‌তে নাচ্‌তে আনন্দে মাতাল হয়ে ছুটে চলল—বাধা বাঁধন ভাঙ্গল।

মাটি তাকে ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু তার গলায় যে ঐশ্বর্য্যের মালা গাছি পরিয়ে দিল, যমুনার কালো বুকে তাজমহলের ছায়া-ছবিখানিতে সেই ইতিহাসই ত লেখা আছে।

এমন কত ছবি তার বুকে আঁকা হয়ে গেল। কত স্পর্শ তাকে আকুল করে, পাগল করে দিল। সে চল্‌ল বিরামহারা হাসির সুরে নাচের তাল মিলিয়ে, তরুণ রবির সোনার আলো, তখন রুদ্রের দীপ্ত চোখের মত জ্বলে উঠেছে। বিশ্বচরাচর নিশ্বাস রুদ্ধ করে পড়ে আছে যেন চেতনা হীন। বাঁকের মুখে ত বনের শ্যামল ছায়াটুকুর কাছে এসে তটিনীর গতি যেন একটু শিথিল হয়ে এল। যেন আর সে বইতে পারে না। ঐখানটায় একটুখানি জুড়িয়ে নিতে চায় সে।

ছোট ছোট ঢেউগুলি আনন্দের গান ভুলে ক্লান্তি ভরে কোলে এসে লুটিয়ে পড়ছে। বাতাস ও যেন মরে গেছে কিন্তু তটিনীর থামা হলনা। সে ছুটল আপনার চলার বেগে আবর্ত্তের সৃষ্টি করতে করতে।

মাটি বারে বারে তার কোমল বুক খানি পেতে দিয়ে বলে—ওগো একটু দাঁড়াও। আমার বুকেই যে তোমার ঠাই।

আঘাতে আঘাতে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে হেসে তটিনী বলে—আমার ঠাই?—নাই—নাই। সে কোথাও নাই।

তাকে চল্‌তে হবে। কিন্তু কোথায়? এযে বিরাম বিহীন চলা! দিনের পর দিন চলে যায় তবু এ চলা ফুরায় না যে।

কিন্তু ফুরাল। চলা তার থাম্‌ল। হাসি গান তার থাম্‌ল। পথের শেষে এসে পৌছল যখন সে সাগরে—

আর কোথাও যাবার নেই। পথ নেই পাখী তাকে গান শুনিয়ে যায় না। বাতাস তেমনি করে স্নিগ্ধ স্পর্শে তাকে আকুল করে তোলে না। বারে বারে মাটিও তাকে আর বুক পেতে বলে না ওগো দাঁড়াও, একটু থাম।

তার প্রাণের সমস্ত হাসি শুকিয়ে গিয়ে জেগে উঠ্‌ল—কান্না। কিন্তু চলার দুর্দ্দমনীয় বেগ

মরে গেল না। পথ নেই, তাই সে শুধু আপনারই বুকে পড়ে আর ওঠে—আর কারো স্পর্শ সে পায় না, কিন্তু তার বুকে ভরা আছে সেই স্পর্শের স্মৃতি।

এই সাগর তার মরণ। এই খানে এসে তার জেগে কাটাবার পালা। কান্নাই তার কাজ। এই জন্যেই ত সাগরের রং নীল, মরণেরই রূপ। রক্তের চিহ্ন মাত্র ওতে নেই।

হাজার প্রাণের দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে ভরা যে তটিনীর বুক। সবাই যে তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি পেতে এসেছিল ছুটে। সবাই যে তার বুকে বোঝা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের বুক হাল্কা করে নিয়েছে কিন্তু তার বোঝা ত কেউ নামিয়ে নিল না! এত প্রাণের ব্যথার বোঝা বয়ে, হাসি তার মুখে ফোটে কি করে?

ও ভার ত কোথাও নামাবার নয়। এমন ঠাই কোথাও আছে কি? ওযে গচ্ছিত রত্ন। ওর একটিকেও ত অবহেলা করবার নয়। তাই প্রাণপণে সবগুলিকেই সে আঁকড়ে ধরে রইল।

এ অনন্ত মরণে ঐ ত তার একমাত্র সান্ত্বনা। ঐ সান্ত্বনা কে বুকে চেপে তার সকল কান্নার মধ্যেও সে বলে হে ঠাকুর তোমায় নমস্কার। ভার আমায় দিয়েছ, সেই সঙ্গে বইবার শক্তি ও দিয়েছ আমায়, নইলে আমাকেই বেছে নিলে কেন? এ আমার মহাসৌভাগ্য। আর কোন সংশয় নেই। আমি বুঝেছি, যে বন্ধনকে অসহ্য মনে হ'য়েছিল, সেই বন্ধনেই আমার মুক্তি লুকিয়েছিল আমি দেখিনি। যাকে মুক্তি ভেবে বন্ধনকে ছিঁড়ে এসেছি সে মুক্তি মরণেরই রূপান্তর।

কান্নার আবেগে মাটির কোলে আশ্রয় নিতে গিয়ে সে দেখ্‌ল—মাটি মরে গেছে। পড়ে আছে তার কঙ্কাল। সে সরসতা নেই! সে হাসিও নেই!

৩

চোখ জিনিসটা যেন বাতায়ন। পাঁজর ঘেরা রুদ্ধ কারার অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে, প্রাণ সময় সময় এই খান থেকে আপনাকে বাইরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু সে ত সহজ নয়। কারণ এখান থেকে চীৎকার করে ত বলা চলে না—সব কথাই নীরবে কইতে হয়। তাই তার খবর সবাই পায় না।

মানুষের স্বভাব কান দিয়ে জানা। চোখ দিয়ে ত নয়। তাছাড়া সব সময় ওটা সকলের খোলাও থাকে না। তাই কোন শ্রান্ত প্রাণ যদি এই বাতায়ন তলে এসে নীরবে অপেক্ষা করে থাকে, তাহলে তার সে অপেক্ষার একটা সীমাও সাধারনতঃ থাকে না। হয়ত কারো সাড়া পায়ও না সে জীবনে। দাঁড়িয়ে থাকাই সার হয়। দরদীর খবর মেলে না।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পায়, সে মূহুর্ত্তটিরই বর্ণনা কি দিয়ে হবে? কে পারবে?

ঐ দুটি চোখে চোখে কি বলা হয়ে যায়? ওর সুখের কাছে বিশ্বের আনন্দ যে ম্লান হয়ে যায়। ওর বেদনার কাছে শত বজ্রাঘাত যে ফুলের আঘাত বলে মনে হয়।

ঐ দুটি বাতায়ন হতে প্রাণ যখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বলে—ওগো তুমি ছিলে এই মাটির পৃথিবীতেই? একি তোমায় আমি দেখছি? তখন ঐ দুটি কথার আড়ালে আরো কি লুকিয়ে রাখে ওরা?

ধীরে ধীরে বাতায়ন বন্ধ হয়ে আসে। প্রাণ যেন গলে গিয়ে জল হয়ে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়। তার পর কি রইল বাকি? আলো না অন্ধকার?

৪

তাপ-দগ্ধ মাটি, আপনারই গ্লানির ধূলায় মলিন শয্যা হ'তে, নীল আকাশের গায়ে পারিজাতের মত স্নিগ্ধ জ্যোতিলেখার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—কি করে ওর স্পর্শ পাওয়া যায়? ওখানে গিয়ে পৌছান যায় কি? ওর স্পর্শে যে তার সমস্ত কলুষ শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে।

এই কথাটি ভেবে ভেবে বুকে তার যে কান্না ওঠে, তা বাইরের হাওয়ায় ভেসে যায় না—প্রকাশ পায় না। আপনার বুকেই জমাট বেঁধে, অচল হয়ে পড়ে থাকে।

তার বাইরের সমস্ত রূপ হাসি গানের নীচে ঐ জমাট বাঁধা কান্না, প্রচণ্ড তেজে জ্বলতে থাকে অহরহঃ—সে নেভেনা তাই তার চোখে ঘুম নেই।

জ্যোতিলেখা, নির্মাল্যের ডালি সাজিয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। করুণায় তার বুক ভরে যায়। বলে—ওগো মাটি, আমি যে তোমার কোন কাজেই এলাম না! তোমার দীর্ঘ শ্বাস যে আগুনের চেয়েও শুষ্ক। তাই তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারিনা—পুড়ে মরে যাই।

মাটি বলে কিন্তু পেতেই যে হবে তোমায়। নইলে আমার জ্বলে মরাই সার হবে। জুড়োতেই যে হবে আমায়।

জ্যোতিলেখা বলে কি করে তা হবে? তুমি যে রেখেছ নিজেকে মরণ জাল দিয়ে ঘিরে।

মাটিবলে—তবে আমিই যাব তোমার কাছে।

উঠ্‌ল মাটি। জমাট বাঁধা কান্না কাল বৈশাখার দুর্নিবার আবেগ নিয়ে ধূলায় নির্মল আকাশ কে মলিন করে, বজ্র গম্ভীর চীৎকারে দিক কাঁপিয়ে, তড়িৎ অসির আঘাতে অন্ধকারের বুক চিরে চিরে ছুট্‌ল মাটি! জাগ্‌ল কান্না—চাই-চাই চাই

কোথায় সে? কোন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে সে? খোঁজ তাকে, বার কর তাকে। একেবারে টেনে এনে আপনার তপ্তমরু বক্ষে চেপে ধর, শান্তি হোক!

আরম্ভ হল খোঁজা। ঘূর্ণি হাওয়ার পাকে পাকে নিষ্পেষিত হয়ে তরু গুল্ম লতা লুটিয়ে পড়ল! বনস্পতির পাতা ছাওয়া রঙ্গিন আস্তরণ গেল উড়ে! তটিনীর জলরাশি সীমা ছাড়িয়ে উঠে এল তীরের ওপর। ভীত ত্রস্ত জীব নীড় ছেড়ে নেমে এল বাইরে—অনাবৃত আকাশের নীচে!

কোথায় সে? আরো কত দূর? সূর্য্য কখন মেঘের আড়াল হতে নীল সাগরের ক্ষিপ্ত অতল জলের তলে নেমে গেছে। বাতাস কেঁদে বলছে—নাই নাই সে নাই দিনের খোঁজা বৃথা এ পৃথিবীতে, এ আকাশে যা আছে তা শুধুই শূন্যতা।

ক্লান্তিভরে মাটি লুটিয়ে পড়ল মাটির শয্যায়। বর্ষণ নাম্‌ল। এ যেন তারই দেহ মনের অবসাদ জল হয়ে ঝরে পড়ছে।

নিশুতি রাত্রি, ঝিল্লি ডাকে না। গাছের শাখাও নড়েনা! শুধু তার ভিজে পাতা হতে বিন্দু বিন্দু জল ধারা ঝরে ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ বাতাস নিশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌ল—ওগো মাটি, বুঝি খোঁজা তোমার সার্থক হয়েছে! চোখ মেলে দেখ—ঐত সে তোমারই বুকের ওপর।

মাটি দেখিল—চোখের জল ঝরে ঝরে তার বুকের যেখানে জমা হ'য়ে রয়েছে, তারই মধ্যে আঁকা আছে ও কার ছবি?

মাটি বল্‌ল—এই কি পাওয়া? কিন্তু আমার যে আর সে তৃষ্ণা নেই! এ পাওয়া যে না পাওয়ারই মত সমান বেদনার।

মাটি পড়ে রইল নিশ্চল নির্ব্বাক। জ্যোতিলেখা তেমনি করেই তাকিয়ে রইল তার দিকে। বাতাস কেঁদে ফির্‌ছে বৃথা—বৃথা—সব বৃথা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা।

(১)

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানব সমাজে অথবা সমাজবদ্ধ মানবের মধ্যে অত্যন্ত বর্ব্বরেরা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। যারা পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানে না, বনের পশু শীকার করিয়া খায়, চাষবাস করিতে শেখে নাই, পারিবারিক বন্ধন যাদের অত্যন্ত শিথিল, নাই বলিলেই হয়,—এরূপ বর্ব্বরেরা জীবনে যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে, অপেক্ষাকৃত সভ্যতর সমাজের লোকে সে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় না। এইরূপ বর্ব্বর সমাজে ধর্ম্মের শাসন বা সমাজের শাসন, দুই চারিটা বাহিরের আচারেতেই আবদ্ধ। নিজেদের মধ্যে তারা অকারণে বা অতি সামান্য কারণে সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি করে। পরস্পরের আততায়িতা হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নতম স্তরের বর্ব্বর সমাজে কোনও প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা নাই। শরীরের শক্তি ও প্রত্যেকের বুদ্ধির কৌশলই সে অবস্থায় আত্মরক্ষার এক মাত্র উপায়। সমাজের সংহত শক্তি দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করে না! কেবল অন্য জাতির আততায়িতা হইতে নিজের জাতিকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে, সমাজ-শক্তি সংহত হইয়া সমাজ-পতি বা সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। এক দিক দিয়া দেখিলে এই বর্ব্বর সমাজে লোকে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে সভ্যতর সমাজে তার শতাংশের একাংশও ভোগ করিতে পারে না।

(২)

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর সমাজের এই স্বাধীনতার সংকোচ আরম্ভ হয়। মানুষ একান্ত একাকীত্বের মধ্যে যতটা স্বেচ্ছাধীন হইয়া চলিতে পারে, আর একজন মানুষের সঙ্গে মিলিয়া বসবাস করিতে গেলেই আর ততটা পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত সর্ব্বদা চলিতে পারে না। মানবের মিলন মাত্রেই তার স্বাধীনতার সংকোচ করে। এইজন্য যে চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া নিজের পিতামাতা, ভাইভগিনী হইতে পৃথক থাকে, সে যে-পরিমাণে স্বাধীন, পরিবার

পরিজনকে লইয়া যে থাকে সে কখনই সে-পরিমাণে স্বাধীন থাকিতে পারে না। পরিবারের মধ্যে বাস করিতে গেলেই পরিবারবর্গের প্রত্যেকের রুচি প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে অপর সকলের রুচি, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর মিলাইয়া চলিতে হয়। এরূপ না করিতে পারিলে পরিবারের মধ্যে কখনও শান্তি থাকিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সমবেত শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিতে হয়।

কিন্তু এইরূপে নিজের স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিয়া মানুষ একটা বৃহত্তর সঙ্ঘের অধীন হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতার যে-পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, তদপেক্ষা অধিকতর সার্থকতা লাভ করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে কখনই নিতান্ত স্বাধীন নহে। তার জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, সুতরাং সে খাদ্যের অধীন। শীত আতপ হইতে দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য তার বাসস্থানের প্রয়োজন সুতরাং সে বাসস্থানের অধীন। শীত নিবারণ কিংবা অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য তার বস্ত্রের প্রয়োজন, সুতরাং সে বস্ত্রের অধীন। প্রজোৎপত্তির জন্য নর-নারীর একত্র বাস করা আবশ্যক; সুতরাং জীবনের এই মুখ্য সার্থকতা সম্পাদনের জন্য পুরুষ স্ত্রীর এবং স্ত্রীর পুরুষের নিকটে স্বল্প বিস্তর পরিমাণে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। নিতান্ত বর্ব্বর সমাজেও মানুষকে এই অধীনতা গ্রহণ করিতেই হয়। আর এ সকল অধীনতা এতটা পরিমাণেই তাহাকে বহন করিতে হয়, যে নিম্নতর স্তরের বর্ব্বর সমাজে আর এক দিক দিয়া দেখিলে মানুষ যে-পরিমাণে পরাধীন হইয়া রহে, সভ্যতর সমাজে সে পরিমাণে পরাধীনতা ভোগ করে না।

(৩)

সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টির জীবনের প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি সভ্যতার মূল লক্ষণ। যে সমাজে যে পরিমাণে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সমাজের শৃঙ্খলা ও শাসনের সাহায্যে নিজেদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার্থকতা সাধন করিতে পারে, সেই সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা সু-সভ্য। একে অন্যের সাহচর্য্য করিয়া সভ্য-সমাজের লোকেরা প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে এক দিকে সঙ্কুচিত করিয়া আবার আর একদিকে তাহাকে বাড়াইয়া দেয়। আমাকে যদি আমার প্রতিদিনের আহার্য্য নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হইত,—অর্থাৎ আমি ভাত খাই আমাকে যদি আমার নিজের প্রয়োজনীয় ধানের চাষ করিতে হইত, মাছ খাই যদি প্রতিদিন মাছ ধরিয়া আনিতে হইত; শাক শব্জী খাই যদি নিজের হাতে সেগুলি বুনিতে ও কাটিতে হইত; তেল নুন ঘি, রাঁধিবার কাঠ বা কয়লা হাঁড়ি বা কলসী প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইত, আমার বস্ত্রের প্রয়োজন, যদি নিজেকে সুতা কাটিয়া তাঁতে ফেলিয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইত, আমার বাসগৃহের প্রয়োজন যদি নিজেকে বাসগৃহের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘর বাঁধিতে হইত, কেবল মাত্র জীবনধারণের জন্য যাহা অত্যাবশ্যক প্রতিদিন যদি সেগুলি নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে এই বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এই দেহ রক্ষা ও দেহের সেবা করিতে গিয়াই আমার সমুদয়, শক্তিও সময় নিঃশেষ হইত। আর সে অবস্থায় আমি কোনও দিন পশুত্বের ভূমি হইতে উঠিয়া উচ্চতর মানবতার

ভূমিতে দাঁড়াইতে পারিতাম না। যে যার সেবা করে সে তার অধীন হইয়া রহে। সে অবস্থায় বাহ্য প্রকৃতি ও নিজের পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই আমাকে একান্তভাবে ইহাদের অধীন হইয়া থাকিতে হইত।

(৪)

সমাজবদ্ধ হইয়া যেদিন আমি দশজনের সঙ্গে মিলিয়া পরস্পরে পরস্পরের অধীন হইয়া একে অন্যের ভার বহন করিতে আরম্ভ করিলাম, সেদিন আমি বর্ব্বর-সমাজোচিত স্বাধীনতার বলিদান দিয়াই উচ্চতর স্বাধীনতার অধিকার পাইতে লাগিলাম। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা অসম্ভব ছিল, সমাজের সংহত শক্তিতে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল। এখন আর আমাকে দিনরাত নিজের ভাবনা ভাবিতে হয় না, সমাজের উপর সে ভাবনা দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরস্পরের কৃতকার্য্যের ফলভাগী পরস্পরকে করিয়া জীবন-ধারণটা সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। একাকী আমি যাহা পারিতাম না, পরিবারের সমষ্টিগত শক্তির সাহায্যে তাহা করিতে পারিতেছি। কেবল পরিবারের সাহায্যে নিজেকে যে-পরিমাণ স্বাধীন করিতে পারিতাম না, সমাজ-শৃঙ্খল ও সমাজশাসনের অধীনতা স্বীকার করিয়া তদপেক্ষা শতগুণ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি। এই ভাবেই সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতা একদিকে সঙ্কুচিত হইয়া আর একদিকে সম্প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

(৫)

এই স্বাধীনতার মূলসূত্র সাহচর্য্য বা আজি কালিকার ভাষায় 'সহযোগ'—ইংরাজিতে যাহাকে co-operation কহে; অসহযোগ বা non-cooperation নহে। সহযোগ মাত্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে; কিন্তু আবার সীমাবদ্ধ করিয়াই, তাহাকে বাড়াইয়া ও ফুটাইয়া তোলে। আর অসহযোগ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বাহিরের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াই মূলতঃ তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই কথাটা না বুঝিলে আমরা স্বাধীনতার নামে বর্ব্বরতাকেই বরণ করিয়া লইব।

সহযোগে জীবন, অ-সহযোগে মৃত্যু; সহযোগে সংযম, অ-সহযোগে স্বেচ্ছাচার, সহযোগে ব্যক্তিত্বের বিস্তার; অ-সহযোগে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই ব্যক্তিত্বেরই বিনাশ। স্বাধীনতার সত্য আদর্শ সমাজজীবনে এবং সমাজবন্ধনের মধ্যেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বাহিরে নহে। সমাজবন্ধন সামাজিক শাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক শাসন সমাজশৃঙ্খলার উপরে এই শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজ শাসনকেই ইংরাজীতে গভর্ণমেণ্ট কহে। আমাদের ভাষায় আমরা ইহাকে রাজা বা রাজ্য কহিয়া থাকি। যেখানে গভর্ণমেণ্ট নাই, অর্থাৎ যেখানে সমাজের সমষ্টিগত শক্তি, সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও কর্ম্মকে সংযত করিয়া না রাখে, সেখানে নিত্য সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সত্য স্বাধীনতা আপনার আসন পাতিবার তিলার্দ্ধ স্থান বা সময় পায় না। যেখানে গভর্ণমেণ্ট নাই, সে অবস্থাকেই অরাজকতা কহে। অরাজকতার অবস্থায় স্বেচ্ছাচারের অত্যাচারে] স্বাধীনতা তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং সত্য স্বাধীনতা যে চাহিবে, সমাজশৃঙ্খলাকে সে রক্ষা করিবেই করিবে।

সমাজ-শৃঙ্খলা, সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের সম্বন্ধ বা সাহচর্য্যের বা সহযোগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সাহচর্য্য এবং সহযোগের উপরেই সমাজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়।

(৬)

সমাজ যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নষ্ট করিয়া দেয়, তখন সে স্বাধীনতা উদ্ধারের করে সমাজ-শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই বাধিয়া যায়। যখন এই সমাজদ্রোহী ব্যক্তি সমাজের অধিকাংশ লোকের সাহচর্য্য বা সহযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে এই সংগ্রামে জয়লাভ করে। এই জয়ের দ্বারা সমাজ শক্তি নষ্ট হয় না, কিন্তু আদিতে যাহা দ্রোহীভাব ছিল, তাহার সঙ্গে আপোষ করিয়া তাহারই মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই ব্যক্তি, সমষ্টির সঙ্গে নিজের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধও স্থায়ী হয় না, চিরদিনের বিচ্ছেদও ঘটে না। এই সংগ্রামে ব্যষ্টি যতদিন পর্য্যন্ত সমষ্টিকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিতে না পারে, ততদিন তার স্বাধীনতা লাভ হয় না। সংগ্রামে স্বাধীনতা নাই। যুযুৎসু ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে পারে না, শত্রুর চাল বিচার করিয়া তাহাকে চলিতে হয়। শত্রুর ইচ্ছায় নহে, কিন্তু সতত শত্রুর কার্য্যের অধীন হইয়া সে পড়ে। স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন বটে। কিন্তু যতক্ষণ না এই সংগ্রামের অবসানে সত্য সন্ধির কিম্বা উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সাহচর্য্য বা সহযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা আপনাকে প্রাপ্ত হয় না। সমাজের অন্তর্গত ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, দুই সমাজের বা জাতির মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বাধিলেও তাহা সেইরূপই সত্য হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শিশুপীড়ন।

যারা পশুপীড়ন করে তারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, কিন্তু সুশিক্ষা ও সুশাসনের দোহাই দিয়া পিতামাতা, শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী নীতি ও ধর্ম্মোপদেষ্টা নির্ম্মমভাবে শিশুপীড়ন করিয়া কোন শাস্তিই পান না। কত পিতামাতা সন্তান হারাইয়া আমরণ বিলাপ করেন "শিক্ষাও শাসনের নামে ছেলে মেয়ের প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম! তারা দু'দিনের জন্ম আমাদের কাছে আসিয়াছিল,—পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়া—বুকে রাখিয়া, কোলে রাখিয়া মানুষ করিলাম না কেন?" কোন কোন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও বোধ হয় শিশুপীড়নলীলা শেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হন। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মনে সর্ব্বদাই এই গর্ব্ব থাকে—"আমরা বালকবালিকগণকে মুক্তির পথে আনিবার জন্ত অবিরল বাক্যবাণবর্ষণ করিয়া বালসুলভ চপলতা দূর করিয়া মুখের হাসি ও মনের স্ফূর্ত্তি বিনাশ করিয়াছি, সে জন্ত আমরা ভগবানের কাছে পুরস্কার পাইব।"

মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শিশুপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন—শিশুদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া জোর করিয়া কোনও একটা পথে পরিচালিত করিলে, তাদের শক্তির বিকাশ হয় না, তারা যন্ত্রস্বরূপ হয়—মানুষ হয় না। যাঁরা জোর করিয়া নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে ধ্রুব প্রহ্লাদ গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁরা শিশুপ্রকৃতির সহিত পরিচিত নন এবং ইহার কুফল কত বড়, সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির জন্য তাহা ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। হাসিতে খেলিতে, আনন্দে স্ফূর্ত্তিতে, বালকবালিকারা নানাপ্রকার শিক্ষায় বাড়িয়া উঠিলে স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞাতসারে নীতিধর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া উঠে। শিশুদের মনে জোর করিয়া নীতিধর্ম্ম ঢুকাইতে চেষ্টা করিলে নীতি ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের বিরক্তি ও বিদ্বেষ জন্মে এবং তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যত প্রকারে শিশু-পীড়ন হয় তন্মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মদণ্ডের শাসন সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। আমরা দেখিয়াছি, যারা প্রচারকশ্রেণীর লোকদের হাতে না পড়ে, তারা যৌবনে উচ্চ উদার নীতিধর্ম্মে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাদের শ্রদ্ধা নিষ্ঠার ভাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় না। বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির নিকট হইতে শিশুরা তিরস্কার, প্রহার ও অনেক রকমের অবমাননা সহ্য কবিতে করিতে যখন বড় হইয়া উঠে, তখন তাহাদের আনন্দ, উৎসাহ, সাহস, বলবীর্য্য, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সকল উপাদান বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালীর কলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া যখন তাহারা বাহির হয় তখন তাহাদের শরীরটি হয় কালীঘাটের কাঠের পুতুলের মত, আর সৃষ্টির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিচিত্র পবিত্র অমৃতরসপূর্ণ মানবমন একেবারে শুষ্ক নীরস মরুভূমির বালুকণার মত হইয়া যায়। এইরূপে মনুষ্যত্বহীন হইয়া যুবকগণ যখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের উপযোগিতা তাহাদের থাকে না।

ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক চার্লস্ ডিকেন্স্ বোর্ডিংএর সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও স্কুলের শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন শক্তিশালী লেখক হইলেন তখন তিনি সেই অত্যাচার কাহিনী জীবন্ত জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে অসহায় বালক বালিকারা মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে না, অত্যা-চারের প্রতিশোধ লইবার যাহাদের শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, তাহারা কাপুরুষ। এই দানবপ্রকৃতির মানব পাশব ব্যবহারের জন্য গুরুতররূপে দণ্ডনীয়। ডিকেন্সের উপন্যাসে শিশুপীড়নের করুণকাহিনী পড়িয়া চোখের জল রাখা যায় না এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতি শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর প্রতি বিষম ঘৃণার উদ্রেক হয়। ডিকেন্সের লেখনী সার্থক হইয়াছে, ইংল্যাণ্ডের লোকের চোখ ফুটিয়াছে, শিশুদের শিক্ষা প্রণালীতে দণ্ডনীতির পরিবর্ত্তে স্নেহনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য দেশের সংবাদ ভাল করিয়া জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে দেখিতেছি ছেলেমেয়েরা যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য চারিদিক হইতে বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। পিতামাতার শাসন তো আছেই, কিন্তু তাহার মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া সে শাসন তত মারাত্মক নয়, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পুলিসের স্থান অধিকার করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কলে পিষিতেছেন এবং অনুগত

পদানত ভৃত্য প্রস্তুত করিতেছেন, ধর্ম্মোপদেষ্টারা ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতেছেন,— এ অবস্থায় মানুষ হইবার আর পথ নাই। কুড়িবৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি শিক্ষা সংস্কার চলিতেছে। বালকবালিকাদের জন্য কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তোতা পাখীর মত বই মুখস্থ করিয়া হয়রান হইতে হইবেনা। অতিরিক্ত পড়ার চাপ দেওয়া হইবে না। শারীরিক দণ্ড উঠিয়া গেল। কিন্তু বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও ঐ আদর্শে গঠিত কয়েকটি বিদ্যালয় ব্যতীত যে বিদ্যালয়েই যাই, দেখিতে পাই, ছেলেমেয়েরা রাশি রাশি বইয়ের পড়ার চাপে ভারাক্রান্ত বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা শিখিতে ও গ্রামার ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিতে করিতে কণ্ঠতালুশুষ্ক হইয়া যাইতেছে, বেত্রদণ্ড উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া—কানমলা, ঘুঁসি কিল, চড় খাইতেছে এবং গাধা গরু, মূর্খ, চাষা প্রভৃতি অপমান সূচক গালি নীরবে হজম করিতেছে। দেখিতে পাই স্কুলে যাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা সকালে প্রায় নটার সময় খায়, তারপর সমস্ত দিন আড়ষ্ট হইয়া ক্লাসে একজায়গায় বসিয়া থাকে, নড়াচড়ার অধিকারও পায় না। টিফিনের সময় একবার একটু নড়ে চড়ে, সে সময়ে সকলের ভাগ্যে খাবার জোটে না। আবার নিয়ম রক্ষার জন্য ড্রিলমাষ্টার বেত হাতে করিয়া মিলিটারি ধরণে ড্রিল শিক্ষা দেন, খালি পেটে ড্রিল করিতে করিতে তাল কাটিয়া গেলে, ড্রিলমাষ্টারের বেত খাইতে হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া কে চোখের জল রাখিতে পারে? বলা বাহুল্য এ দৃশ্য আমি ছেলেদের স্কুলেই দেখিয়াছি, মেয়েদের স্কুলে দেখি নাই। ব্রাহ্মসমাজের লোক সংস্কারকের দল, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী, ছাত্রাবাস ও ছাত্রী আবাসের তত্বাবধায়ক তত্বাবধায়িকা হইয়াছেন এবং উচ্চকণ্ঠে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ দিতেছেন তাঁহারাও সকলে বালক বালিকাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিতে পারেন না কেন বুঝিতে পারি না। কোন ছাত্রী আবাসের ছাত্রী ষোলআনা বাধ্যতা স্বীকার না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া, একজন ধাম্মিকা শিক্ষিকা তাহাকে স্নানের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অনাহারে অনিদ্রায় হতভাগিনীকে সেই জেলখানায় থাকিতে হইয়াছিল। আর একজন ব্রাহ্মিকা পড়া মুখস্থ করে নাই বলিয়া একটি ছাত্রীকে কয়েকঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে জন্য তাহার জ্বর হইয়াছিল। একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বিএগ্রস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা কোন ছাত্রাবাসের তত্বাবধায়করূপে প্রভাতের উপাসনায় অনুপস্থিত ছাত্রকে উপবাস দণ্ড দিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্তধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রধান শিক্ষক সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর সাত আট বৎসরের ছেলেরা ক্লাসে টুঁশব্দটি করিলে এবং উপাসনার সময় চঞ্চল হইলে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। এই রকম অত্যাচারের আরও অনেক কথা জানি। এখনও অনেক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি এই রকমের অত্যাচার হইতেছে। তবে শুনিয়াছি, আজকাল কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সস্নেহ ব্যবহার করা হইতেছে। ছেলে মেয়েদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন জানেন, বাড়ী ছাড়িয়া তাহারা যখন বোর্ডিংএ আসে তখন তত্বাবধায়ক তত্বাবধয়িকারা তাহাদের আহার সম্বন্ধে যে সংযমের ব্যবস্থা করেন, তাহার সঙ্গে জেলখানার কয়েদীদের আহারের তুলনা করা যাইতে পারে। শাসনদণ্ড পরিচালক নির্ম্মম শিক্ষকগণ ও মাতৃভাব বর্জ্জিতা শিক্ষয়িত্রী

ও ছাত্রী আবাসের তত্ত্বাবধায়িকাদের হাতে পড়িয়া বালকবালিকাদের কোমলভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, বোর্ডিংএর সুপারইনটেন্‌ডেণ্টও মেট্রনদের প্রকৃতিও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বৃত্তি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও ষ্ট্রীট প্রীচার, কাহারও পুলিস কর্ম্মচারী, কাহারও বা জেলখানার দারোগা হওয়া উচিত ছিল।

বাল্যবিবাহ রহিত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত, জাতি ভেদের মূলোৎপাটন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার এবং প্রতিমাপূজা হইতে নিরত করিয়া নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার জন্য অনেক লোক জীবন উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিব্য আরামে বসিয়া আছেন;—বালক বালিকারা উৎপীড়িত হইয়া মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বড় বড় কাজে হাত দিয়াছেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ছোট কাজ করিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। যাঁহারা কাব্যসাহিত্যরসে ভরপূর, সত্য সত্যই সুশিক্ষিত, সদাপ্রফুল্ল ও সুরসিক, যাহারা স্নেহপ্রবণ, সহিষ্ণু পিতামাতার মত ছেলেমেয়েদের সকল আবদার সহ্য করিয়া, আদর করিয়া ভালবাসা দিয়া, শিক্ষা দিতে পারেন—তাঁহারা পাড়ার পাড়ায় বালকবালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইলে বহুসংখ্যক হতভাগ্য বালকবালিকার উদ্ধার সাধন হইবে। শিশুরা সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। তাহারা উৎপীড়িত, উপেক্ষিত হইলে অন্যান্য বিবিধ সংস্কার দ্বারা সমাজকে সুগঠিত উন্নত করিয়া তোলা অসম্ভব। এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া—নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, শিশুপীড়ন-পাপ-কলুষিত অভিশপ্ত সমাজের নিদারুণ অকল্যাণ হইবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে জীর্ণভিত্তি উচ্চচূড় মন্দিরের মত আমাদের সমাজমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আমাদে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

শিক্ষা জগতের যৎকিঞ্চিৎ (৩য়)

শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের এবং শিক্ষায়তনের যে সম্বন্ধ তা সব সময়ে ভাল রূপে রক্ষিত হয় না। সহকর্মীদের জন্য যে বিশ্বস্তচিত্ততা, যে উদারতার প্রয়োজন তার অভাব অনেক যায়গায় লক্ষিত হয়ে থাকে, ঈর্ষ্যা এবং বিদ্বেষ এই সম্পর্ককে অনেক সময় কলুষিত করে ফেলে। এ সবের জন্য দোষী প্রধান শিক্ষক এবং নিম্ন শিক্ষক উভয়েই। অনেক যায়গায় দেখা যায় যে প্রধান শিক্ষক যিনি, তিনি গল্পের আফিসের বড়বাবুর মতই বিবেচনা শূন্য হয়ে হৃদয়-হীনের মত নিম্নতন দিগের উপর অত্যাচার করতে থাকেন, আবার অনেক সময় দেখা যায় যে নিম্নতনেরাও আপনাদের কর্ত্তব্যপালন করেন না, প্রধানের নরম মনের সুযোগ অবলম্বন করে আপনাদের কাজে যথেষ্ট ঢিলা হয়ে যান।

দারিদ্র বোধ যাঁর বেশী আছে, যিনি নিজেও শ্রম পটু এবং অন্যদের শ্রম-বিমুখ চিত্তকে উদ্যত করে তুলতে সচেষ্ট এমন অধ্যক্ষেরা প্রায়ই নিম্নতনদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন এ আমি অনেক দেখেছি।

শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তা যে হিংসা দ্বেষে কলুষিত হয়ে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, ছাত্র ছাত্রীবর্গের মধ্যেও ভেদ আনয়ন করে, এও আমি অনেক যায়গায় দেখেছি। আমাকে এক জন পরুষ প্রোফেসার বলেছেন যে এ ব্যাপারটা বালিকা বিদ্যালয়েই বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ছেলেদের স্কুল সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা যে আছে তাতে করে সে গুলি যে একেবারে এ দোষ-বিবর্জ্জিত তা আমি জোর করে বলতে পারি না। একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই বিষ-জর্জ্জরিত মন নিয়ে অপর একজনের বিরুদ্ধ সমালোচনা তাদের ছাত্র বা ছাত্রীর সামনে যখন করেন তখন যে তিনি একটা হেয় রকমের বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করছেন তা তাঁর মনে উদয় হয় না বোধ হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রিন্সিপাল তাঁর পদের সুযোগ অবলম্বন করে নীচের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে সামান্য কারণেই কিম্বা কারণ না থাকা সত্বেও অপমান করেন। গুরুতর কারণ থাকলেও শিক্ষকের পদমর্য্যাদা যে ছাত্রের সামনে রাখা কর্ত্তব্য এবং যে ক্ষেত্রে রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে সেখানে তার জন্য দুঃখিত হয়েই অবস্থাটা পরম উপভোগ্য একটা কিছু এ রকম ভাব না দেখিয়ে, কোনও রকম অপমান কর্ব্বার উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষায়তনের মঙ্গলের জন্যেই কাজটা করা হচ্ছে এই ভাবে, যে যা বল্‌বার কর্‌বার তা বল্‌তে এবং কর্‌তে হয় তা অনেকে বোঝেন না। অপরের দোষ ত্রুটির দোহাই দেখিয়ে আপনার উপরি-ওয়ালাত্বটা জাহির করাটাই একটা বড় কাজ বলে ভুল করেন।

আমাদের দেশের কয়েকজন ইংরাজ প্রিন্সিপ্যাল অধীনস্থ দেশীয় প্রোফেসারের উপর এরকম ব্যবহার করে বেশ নাম করে নিয়েছেন, খবরের কাগজেও কারো কারো এ বিষয়ে খ্যাতি বেরিয়ে গেছে।

এক একজন প্রিন্সিপ্যাল এরকম আছেন দেখেছি, যাঁরা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে কিছু বলেন না কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তাঁদের বুদ্ধির স্বল্পতা, ব্যবহারের দোষ সম্বন্ধে বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই আলোচনা করেন।

কটক কলেজে থাকতে একদিন লজিক ক্লাশে formal এবং material truth সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বোর্ডে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যা formally সত্য কিন্তু materially মিথ্যা। ক্লাশ শেষ করে যাবার সময় সেটা মুছে দিয়ে যাইনি। আমাদের ইংরাজ প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ঢুকেই এই উদাহরণটা পড়ে আমার বুদ্ধি এবং আমার শিক্ষা-মাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নিষ্ফল ক্রোধে জর্জ্জরিতা আমার ছাত্রীবৃন্দ অশ্রুমুখী হয়ে ওঠেন। আমি ক্লাশে এসে তাঁদের চেহারা দেখে তাঁরা মারামারি করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হই। তখন আর কিছু না বলে ক্লাস শেষ করে ছুটির সময় গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে নিতান্ত নিরীহের মত জিজ্ঞাসা কর্‌লাম যে আমার পড়ান সম্বন্ধে তাঁর কিছু বল্‌বার আছে কি না। তিনি ক্লান্তে বল্লেন

"না"। আমি তখন বল্লাম "ছাত্রীদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যে আপনার আমার পড়ান সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আছে ?" তাতে তিনি বল্লেন "হাঁ, লজিক যা তুমি পড়াচ্ছ তা ত সব ভুল। বোর্ডে যা লিখেছ সেটা ত যে লজিক জানে না, সেও জানে যে মিথ্যা।" আমি তাতে বল্লাম "আমার লজিক পড়ানোর সময় সেটা শুনে যদি আপনি বলতেন যে আমি ভুল পড়াচ্ছি ত মানতুম। আপনি ত আমার পড়ান শোনেননি। তারপর ওটা যে মিথ্যা সেই কথাই আমি ছাত্রীদের শিখিয়েছি, সত্য বলে শেখাইনি। আমার বুদ্ধি এবং আমার শিক্ষাপীঠ সম্বন্ধে তাদের কিছু বল্‌বার আগে আমায় বল্লেই বোধ হয় ভাল হত, এত বড় ভুলের তামাসার বোঝাটা আপনার বইতে হ'ত না।" এই ইংরাজ মহিলার এই ছিদ্রান্বেষণ-পরতার জন্য আমরা তাঁর সদ্‌গুণ আছে তা অনেক সময়ই বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

এটা অনেক সময় দেখা যায় যে, অল্প বেতনে যাহাদের নিয়শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করি তাঁহাদের অনেকের বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি খুব উঁচুদরের নয়। বিদ্যাশিক্ষায়ও এঁরা খুব অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তারপর কাজে এসে লাগেন না। কিন্তু তাই বলেই যে কথায় কথায় এঁদের প্রতি "তুমি কি জান" বা "তুমি কিছু জান না আবার এর মধ্যে বলতে এসেছ" এরকম কথা প্রয়োগ করা ভাল নয়। স্কুলের শিক্ষক সমিতির অধিবেশনে অনেক প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে এরকম ভাব অবলম্বন করতে দেখা গিয়ে থাকে। এঁরা ভুলে যান যে নিয়তন যদি তাঁরই মত বুদ্ধি বা শক্তিসম্পন্ন হন্ তবে তার নীচে কাজ করবার জন্য আস্‌বেন কেন ?

আমি কোন কোন প্রিন্সিপ্যালকে এরকম ব্যবহার করতে দেখেছি যেন তিনিই জগতে এক মাত্র কর্ম্মী বা শক্তিসম্পন্ন, তাঁর তিলেক অদর্শনে সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে যাবে। এঁর সহকর্ম্মীরা সকলেই অকর্ম্মা, তাঁহাদের উপর কোনও কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকার যো নাই, কাজেই এঁরা সদাই ব্যস্ত, কাহারো কোনও অনুরোধ রক্ষা করা কিম্বা বন্ধুবান্ধবের কিছু সময় দেওয়া এঁদের সাধ্যাতীত। এ রকম একজন ব্যস্তবাগীশ কোনও প্রিন্সিপ্যালকে আমি একবার একটা কাজ করতে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় দেখেই "আমার মর্ব্বার সময় নাই আমি কখন যে কি করি। এই যে কাজ আমার ঘাড়ে, এ ফেলে কি কিছু আর কর্ব্বার যো আছে" বলে এমন চীৎকার জুড়ে দিলেন যে আমি প্রায় থতমত খেয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বল্লাম "একদিন দুঘণ্টার জন্যও আপনি কলেজটী কোনও সহকর্ম্মীর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে পারেন না ? আমিও ত দেখুন আস্‌ছি। একটা দিনে আর কি হয় ? রোজকার কথা ত বলা হচ্ছে না আর এটাও ত একটা খুব বেশী ভারী কাজ"। তিনি তাতে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বল্লেন "আরে তুমিও যেমন। আমার সহকর্ম্মীরা কি আর তেমন ? তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া মানেই সব লণ্ডভণ্ড হওয়া। কত বড় কলেজ এটা।" আমি তখন বল্লাম "আপনার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ ত অনেকদিন আপনার সঙ্গে কাজ কর্‌ছেন ?" তিনি উত্তর দিলেন "হাঁ, ১২।১৪ বৎসর কেউ কেউ আমার সঙ্গে কাজ কর্‌ছে।" "তবে আপনি কি কাজ কর্‌লেন ? ১২।১৪ বৎসরে একজন বুদ্ধিমান্ লোককে সর্ব্বদাই আপনার সাহচর্য্য দিয়ে আর কর্ম্মপ্রণালী দেখিয়ে যদি কি করে কাজ কর্‌তে হয় তাই না শেখাতে পার্‌লেন তবে আপনার কর্ম্মক্ষমতার প্রশংসা ত খুব কর্‌তে পারলাম না। আমার ছোট্ট কলেজ হলেও আমি ত ২।৪ জনকে এমন

করে শিখিয়ে নি, যে, আমি যদি ছুটীর জন্য বাহিরে যাই বা কয়দিন না থাকি ত খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ না হলেও, কাজটা বেশ চলে যায়। ধরুন, আপনার যদি অসুখই করে তবে ত কলেজটা আপনার অনুপস্থিতিতে গোল্লায় যাবে। লোক তৈরী করার দিকে মন দেওয়াটা আপনার একটু উচিত ছিল না কি ?" এর পর থেকে সেই ব্যস্তবাগীশ লোকটী আমার কাছে আর কোনও দিন আপনার সহকর্ম্মীদের সম্পূর্ণ অপটুত্ব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। আমার কাজটা ঠিক আমার মত ক'রে আরেকজন করে না, এবং অনেক সময় আমার অবর্ত্তমানে অন্যে যা করে তাতে আমার মনে পূর্ণ তৃপ্তি আসে না, মনে হতে পারে যে আমি করলে আরও ভাল হ'ত কিন্তু তাই বলেই আমি না করলে যে কাজটা একেবারে অচল হ'য়ে পড়্‌বে, আর কেউ তাকে কর্‌তে পার্‌বে না, এত বড় আত্মম্ভরিতা নিয়ে যে প্রিন্সিপাল কাজে লাগেন তিনি যে কর্ম্মক্ষেত্রে খুব সিদ্ধিলাভ করেন তা নয় এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তার মনের গতির জন্যই তিনি সহকর্ম্মীদের আন্তরিক সহযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

নিম্নশিক্ষকেরা প্রায় সকলক্ষেত্রেই অতি অল্প বেতন পান। তাঁদের ঐ সামান্য আয়ে অনেক স্থলেই বড় সংসার প্রতিপালন করতে হয়। ভদ্রলোকের ভদ্রয়ানা এই আয়ে রক্ষা করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা আমাদের দেশের কেরাণী বাবু এবং মাষ্টার মশাইরা যেমন বোঝেন আর কেহই বোঝে না। এই কারণেই মাষ্টার বাবুরা অনেক সময়ে দায়ে প'ড়ে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানহীন হন, শত অপমান, শত পীড়ন বহন করেও আপনাদের কাজটাকে প্রাণপণ বলে প্রায়ই আমরণ আঁকড়িয়ে ধরে থাকেন। তাঁদের এই ভীষণ সংগ্রামের ফলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনেক সময় লোপ পেয়ে যায় বা যেতে পারে এই মনে করে উপরিওয়ালারা কখনো কখনো তাঁদের আপনাদের হাতের পুতুল করে তুল্‌তে চেষ্টা করেন। আমি জানি একজন নিম্নশিক্ষকের কথা, যাকে তাঁর প্রিন্সিপ্যাল রীতিমত চেষ্টা এবং পরিশেষে ভয় প্রদর্শনের দ্বারা এমন একটা কাজ করাতে চেয়েছিলেন সেটাকে মানুষ মাত্রেই হেয় বলে বিবেচনা কর্‌বে। এই ব্যক্তিটা কিছুতেই স্বীকার না করায় তাঁর প্রিন্সিপ্যালের অত্যন্ত বিরাগ ভাজন হন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন "তুমি কি জান না আমি তোমার কি করতে পারি। তুমি যদি এ কাজটা না কর ত আমি তোমার নামে রিপোর্ট কর্ব্ব।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন "হাঁ, আমি জানি আপনি আমার প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু তাই বলেই ত আপনার কাছে আমি আমার বিবেক বুদ্ধিকে বাঁধা দেই নাই। আপনার যা ইচ্ছা হয় কর্‌বেন।" সৌভাগ্যক্রমে এঁর পিছনে পরাক্রমশালী বন্ধুরা ছিলেন কাজেই এঁর চাকুরীটা বজায় থেকে গিয়েছিল। তবে পদে পদে নানারকমে এঁকে অনেক গ্লানি সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু কত জনে সহায় অভাবে অনিচ্ছা সত্বেও অন্যায় করতে বাধ্য হন তার খবর কে রাখে ?

তবে সব সময়েই যে প্রিন্সিপ্যাল অবিবেচক, হৃদয়-হীন ও নির্ম্মম হন এবং তার Staff মেম্বাররা সকলেই ভাল এরকম নয়। অনেক স্থলে দেখা যায় এঁদের সততার অভাবে প্রিন্সিপ্যালকে অতিশয় কষ্ট পেতে হয়। অনেক সময় এঁরা এমন অবিবেচক নির্ম্মম হন যে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

আমি কোনও একটা প্রাইভেট কলেজের কথা জানি যেখানে কলেজের কোনও বিশেষ

সঙ্কটের সময় কয়েকজন অধ্যাপক দল বেঁধে এসে বলেছিলেন "আজই আমাদের মাহিনা না বাড়িয়ে দিলে আমরা ক্লাশে অধ্যাপনার কাজে যাব না।" তাঁরা বেশ ভাল রকমেই জানতেন যে তাঁরা যদি শ্রেণীতে সেদিন না যান ত কলেজটার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সেইদিন আইনের ভয় দেখিয়ে তাঁদের কাজে যেতে বাধ্য করা হয়। পরে তাঁদের মাহিনা বাড়ে নাই এবং ঐ মাহিনায় তাঁরা তারপর অনেকদিনই কাজ করেছিলেন, হয়ত আজও করছেন।

এ রকম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী খুবই দেখা যায় যে অধ্যাপনার বিষয় বাড়ীতে চিন্তা করে আসেন না এবং ক্লাশে এসে পড়ায় গোঁজামিল দেন। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে এ প্রকার culpable negligence এর দরুণ আইন করে শাস্তি বিধানের উপায় থাকা উচিত বলে সময় সময় মনে হয়।

আমার এক সহকর্ম্মিণী আমি নিম্নশ্রেণীর পাঠ ও বাড়ীতে দেখে আসি শুনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করেছিলেন। ইনি যখন বি, এ, পাশ তখন নিজে নিশ্চয়ই এত বিদুষী যে, বাড়ীতে কিছু দেখে আসা অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁর ক্লাশ পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলুম তিনি playing croquets এর অর্থ বলে দিয়েছেন তাস খেলা। তাঁকে ডেকে আমি বল্লাম "আপনি মেয়েদের এ অর্থ বলে দিয়েছেন? এতো নয়। আমি আজ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম যে।" তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বল্লেন "আমি ও খেলার বিষয় কিছু জানি না। Alice বলে একটা মেয়ে খেল্‌ছিল বলে মনে কর্‌লাম তাস খেলা। আমি অত অভিধান দেখি না।" তাঁকে অবিশ্যি বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল যে অভিধান দেখাটা একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার। এ রকম যে কত সপ্রতিভের কাছে আমাদের শিশুরা কত গোজামিল, কত ভুল প্রমাদ শিক্ষা করে যায়, তার হিসাব কজন রাখি! এই জাতীয় অলস, পরিশ্রমবিমুখ লোকেরাই কৌতূহলী ছাত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিমুখ হয়ে পড়েন তাও দেখেছি।

সুপরিদর্শনের অভাবের সুযোগ নিয়ে, কত যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বৎসরের প্রথম দিকে নিজের কাজে ঢিলা দিয়ে শেষে তাড়াতাড়ি কোনও রকমে, তাঁদেরই দোষে কর্ম্মবিমুখ হয়ে গেছে যে ছাত্র ছাত্রীর মন, তাকে জোর করে খানিকটা বিদ্যা গিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তার সংখ্যাও বড় কম নয়। এই সব ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে পরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজ যে কি কঠিন হয়ে ওঠে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। যাঁদের দোষে শিশুদের গোড়াপত্তনী কাঁচা হয় তাঁরা যে শুধু শিশু এবং পিতামাতার কাছেই অপরাধী, তা নয়, সহকর্ম্মী, শিক্ষায়তন এবং মানব-সমাজের কাছেও গুরুতর অপরাধে অপরাধী। তাঁদের দোষেই সহকর্ম্মীদের প্রাণপণ যত্ন অনেক সময় নিষ্ফল হয়ে পড়ে। পরিদর্শনের ত্রুটীর জন্য এই সমস্ত গোলমাল বিশৃঙ্খলার হাত এড়াবার জন্য আমি আমার নিম্নস্থ প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা খাতা দি। এই খাতাতে তারা প্রতিদিন কতটা কাজ হ'ল, কি কারণে যতটা করতে চান ততটা কাজ হয় নাই, এই সবের একটা হিসাব রাখেন; আমি সপ্তাহের শেষে সে হিসাবটা পরীক্ষা করি। মাসের পূর্ব্বে তাঁরা মাসের কাজের যে একটা তালিকা করেন মাসান্তে সেই তালিকাটার সঙ্গে কৃত কাজের হিসাবটা মিলালেই শ্রেণীর শিক্ষালাভ-পটুতা এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালীর একটা মোটা ধারণা জন্মে এবং দোষ ত্রুটী সংশোধনের উপায় চিন্তা করা

অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। একজন পণ্ডিতের কাজের হিসাব একটু বেশীরকম সন্তোষজনক হয়ে উঠ্‌ছিল। একবার দেখলাম যে সপ্তাহের মধ্যে যেদিন ছুটী ছিল কোনও কারণে সেইদিনও তিনি অনেকখানি পড়িয়ে ফেলেছেন শূন্য ক্লাশকেই। তাঁর কৈফিয়ৎ চাওয়াতে তিনি বল্লেন "আমি যেদিন যতখানি পড়াব মনে করি, তার হিসাব দি। ওদিন ছুটী না থাক্‌লে যতখানি পড়াতাম তার হিসাব দিয়েছি।" তাঁকে তখন আবার বিশেষ করে সমঝিয়ে দিতে হল যে আশার হিসাব চাওয়া হয় নাই, কৃত কাজের হিসাব চাওয়া হচ্ছে।

একদল লোক আছেন যারা কারণে ও অকারণে আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে তৎপর। তাঁরা সর্ব্বদাই মেজাজটা রোখা করে আছেন পাছে প্রিন্সিপ্যাল বা কমিটি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেন। আমি কন্যামহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ কর্‌তে না কর্‌তেই এই রকম একটা মনের সাক্ষাৎলাভ করি। ইনি আমি এসেছি সংবাদটা পাওয়া মাত্র ধরে নিলেন তিনি যে সব সুন্দর আইডিয়া এবং বন্দোবস্ত এই বিদ্যালয়টীকে উপহার দিবেন তার প্রশংসা তাঁর কাছে না গিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হবে। তাঁর এই ন্যায্য অধিকারে যাতে আমি কোনও রকমে অন্যায় দাবী না ধরে বস্‌তে পারি তার জন্য আট ঘাট বাধতে তখুনি আরম্ভ করে দিলেন, বিদ্যালয়ের কমিটির কাছে মস্ত এক আবেদন পাঠিয়ে। আমি যে তাঁর প্রাপ্যটা নেবোই এ বিষয়ে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে আমাকে প্রিন্সিপ্যাল কর্‌লে তিনি কাজ কর্‌বেন না এমন ভয়ও দেখালেন। অনেকদিন পরে কোনও কারণে এই নিয়ে কথা হওয়ায় তিনি বল্লেন যে "আমি ত আপনাকে জানতাম না, তাই ও রকম সব লিখেছিলাম।" ইনি নিজেকে খুবই বুদ্ধিমতী বলে বিবেচনা করেন, আমি তাই গম্ভীর ভাবেই বল্লাম "না জেনে আমার বিষয়ে ওরকম লেখা এবং কমিটির মেম্বরদের হঠাৎ খুব বেশী পক্ষপাত দোষে দুষ্ট মনে করাটা আমাদের কাছে খুব বুদ্ধির কাজ বলে কিন্তু ঠেক্‌ল না।"

কলম্বোয় থাক্‌তে একবার এই প্রকৃতির একটা লোক আমাদের কলেজে কাজপ্রার্থী হয়ে আসেন। তিনি এসেই আমায় বল্লেন "আমি শুনেছি, আপনি মেটার্ণিটী লীভ্ দিয়ে দিয়ে থাকেন, আপনাকে আমি অনেকগুলি প্রশ্ন তাই কর্‌তে চাই।" তিনি একটা লম্বা কাগজ বার কর্‌লেন, তাতে ছোট ছোট অক্ষরে প্রায় ওটিপঞ্চাশ প্রশ্ন লিখে এনেছিলেন তার অনেক বাদ সাদ্ দিয়ে মোটামুটি তাঁর বক্তব্য এই দাঁড়াল যে, "তিনি কুমারী, তাঁর মেটারণিটী লীভের প্রয়োজন হবে না কিন্তু যদি তাঁর টাইফয়েড বা এ রকম কোনও দুরন্ত রোগ হয় তাহলে আমি তাঁর কি ব্যবস্থা কর্ব্ব?" আমি বল্লাম "আপনাকে রোগশয্যা থেকে ধরে এনে ক্লাশের চেয়ারে বসিয়ে দোবো না এটা নিশ্চয়ই। Sick leave পাবেন। "আপনি —কে Maternity leave দিয়েছেন পুরা মাহিনায়, তার পর ছোট্ট বেবীকে নিয়ে যাতে তিনি কাজ চালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন শুনলাম, আমার বেলা কি কর্ব্বেন? "মাতৃত্বের বেলা আমি ১মাস মাত্র পুরা মাহিনায় ছুটী দেবার বন্দোবস্ত করেছি। রোগের বেলা আধা মাহিনায় তিনমাস দি; আপনার বেলা তাই হবে। "ধরুন, আমার যদি টাকার দরকার হয়, রোগের সময়।"

আমি অগ্রিম মাহিনা ও দি, ২।৩ বার আমার দিতে হয়েছে, সেটা ধারের মত দেওয়া হয়

পরে দরকার বুঝে মাসে ২ মাহিনা থেকে কেটে নিই কিম্বা একবারেই ফিরিয়ে নি।" "আমি যদি মরে যাই ?" —আমার তখন বিরক্ত বোধ হচ্ছিল আমি উঠে বল্লাম "টাকাটা Bad debts এর তালিকায় ফেলে আপনার Funeral এ যাব। হয়ত কলেজ থেকে একটা wreath এর বন্দোবস্ত ও করে দিতে পারব।" তিনি তাতে আমার উপর মহা চটে কাজের সম্বন্ধে আর কিছু না বলে প্রস্থান করলেন। হয়ত এরকম ব্যবহার আমার উপরি ওয়ালার হৃদয় হীনতারই পরিচয় দেয় কিন্তু এ গুলি নিম্নতনের হৃদয়ের যে ভাবের পরিচয় দেয় তাত খুব প্রীতিকর নয়।

আবার একদল আছেন যাদের ঈর্ষ্যা তাদের এমন ভাবে পরিচালিত করে অন্য লোকের হাসি পায়। দরদীর কাছে যে শুধু তাঁরা, যাকে ঈর্ষ্যা করছেন তার দোষ কীর্ত্তন করেন তা নয় তারা চান কেহই সে লোকটাকে ভাল না বলে এবং ভাল না বাসে। ছাত্র ছাত্রীরাও যাতে অন্য লোকটাকে ভাল না বাসে তার চেষ্টা ত করেনই এবং ভালবাসছে জানলে সেটা আপনাদের প্রতি একটা অন্যায় মনে করে তার জন্য রাগ এবং দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। আমি এক জনকে গাল ফুলিয়ে একথা কোনও ছাত্রীকে বলতে শুনেছি "তুমি তো—কে ভালবাস, তাহলে তুমি তো আমাকে দেখতেই পার না।" ছাত্রী বেচারী ত অবাক হয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল "কে ভালবাসলে কি এঁকেও ভালবাসা যায় না ?" আমি বল্লাম, "কেন যাবে না ? খুব যায়।" তারপর আমি সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ডেকে বলে দিলাম যে "আমি এ রকম ধরণের কথা হয় তা চাই না। আমি এটা অত্যন্ত অন্যায় মনে করি যে ছাত্র ছাত্রীদের সরল মনে এরকম একটা ঝগড়ার ভাব জানিয়ে দেওয়া। কোনও দুইজনের মধ্যে খুব অবনিবনা থাকতে পারে কিন্তু তাতে করে কোনও তৃতীয় সেই দুজনার সঙ্গেই ভাব থাকা অসম্ভব জিনিস নয় যখন, তখন সেই ভাবটাকে নষ্ট কর্ব্বার অধিকার আমি এই দুজনার কাকেও দিতে পারি না।"

এই প্রকৃতির লোকেরা কখনো কখনো যার প্রতি বিরক্ত তাকে নিজেরা কিছু বলেন না কিন্তু নিজেদের প্রিয়পাত্রদের দ্বারা তাকে নানারকমে খোঁচা দেন, কখনও কখনও যেখানে অন্য লোকটা সরল প্রকৃতির, সহজেই আস্থাবান্, সেখানে এরকম খোঁচা মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক ও হয়ে ওঠে দেখেছি। আমি একজনকে জানি যিনি করকোষ্ঠি গণনায় খুব বিশ্বাস করেন, লোকটী বেশ সরল প্রকৃতির এঁকে শিক্ষায়তনের অধিকাংশই এঁর সরলতা এবং অমায়িকতার জন্য পছন্দ করত, একজন সহকর্ম্মিণীর কিন্তু কিছুতেই ভাল লাগত না যে, সকলে আর কাহাকেও প্রশংসা করে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর একটী ছাত্রীর সঙ্গে এই সহকর্ম্মিণীটির বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে এবং তারপরই এই ছাত্রীটি এসে এঁর করকোষ্ঠি গণনা করে এমন কথা বলেন যা বিশ্বাস করে বেচারী অনেক দিন পর্য্যন্ত মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করেন। এই ছাত্রীটিকরকোষ্ঠি গণণা এবং নখদর্পণ জানেন বলেই সকলের ধারণা ছিল। এবং সেই জন্যই তিনি ইচ্ছা করে এঁকে এই সব মিথ্যা বলে বেদনা দেন, শুধু আপনার প্রিয়পাত্রীকে সুখী কর্ব্বার জন্য।

শিক্ষায়তনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রায়ই সময় অসময়ে তাহার নিন্দা করা এবং কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গোপনীয় বিষয় সমূহের প্রকাশ করে দেওয়া এই দুই রূপ ধারণ করে।

এই সমস্তই প্রায় নিজের দায়িত্ববোধহীনতা এবং কর্ম্মের পবিত্রতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার অক্ষমতা হতেই প্রসূত। শিক্ষাদান ব্যাপারটা যতদিন ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত থাকবে, ততদিন এর মধ্যে এই রকম অনেক বিশৃঙ্খলা এবং অনেক আবর্জ্জনা জড় হতে থাকবে, কারণ এগুলি প্রায় সবই ব্যবসায় বুদ্ধির রেষারেষি প্রণোদিত। তবে শিক্ষকতা ব্যবসা যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা যদি এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই ব্যবসাটা শুধু দিলাম কত তার হিসাব রাখার ব্যবসা, পেলাম কত'র নয়, তা হলে বোধ হয় ত আবর্জ্জনার স্তূপ অনেকটা কমে যেতে পারে। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

বকের বদনাম

যে বলাকা-পক্ষ-পবন বিধূনিত নভোমণ্ডলের চিত্র সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই বিসকণ্ঠি বিহঙ্গের ভূমিতে বিচরণশীল জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহার দেহের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে বটে; কিন্তু সে যে সমাজবদ্ধ মানবের কত বড় উপকারী বন্ধু, অথচ অকারণে এত অপবাদ সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, এবং বুঝিতে পারিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমাও থাকে না। সাধারণতঃ বিহঙ্গ মাত্রেরই দেহ সৌষ্ঠব অথবা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমাদিগের মনোহরণ করে বলিয়া আমরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই; কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গনে, বনে জঙ্গলে, জলাশয়ে মাঠে, তরু কোটরে তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা লক্ষ্য করিতে পারিলে বিহঙ্গ চরিত্রের যে দিকটা আমাদিগকে চমৎকৃত করে, সেই utilityর অথবা economyর দিক হইতে যে শিক্ষা অর্জ্জন করা যায় সেই সম্বন্ধে, এস্থলে এই বককে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কথার অবতারণা করিতেছি। বক আমাদের বাংলা দেশে অত্যন্ত পরিচিত পাখী। কিন্তু বোধ হয় এক হিসাবে এখনও আমাদের কাছে সে অনেকটা অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। সে যে অযাচিত ভাবে কৃষিজীবী বাঙ্গালীর কত উপকার করিয়া আসিতেছে তাহার খবর আমরা রাখি না। শুধু যে সে সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য আছে তাহা নহে, আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না, বক না থাকিলে অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর কি অবস্থা হইত তাহা একবার ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত আমাদের নাই। পরন্তু আমরা বক চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিতে প্রস্তুত, এবং যে সকল ভণ্ড কুলাঙ্গার বঙ্গ সমাজের অনিষ্ট করে তাহাদিগকে বক ধার্ম্মিক বলিতে কুণ্ঠিত হই না। এমনই করিয়া বকচরিত্রের উপর একটা কলঙ্ক আরোপিত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ সেই কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন কি না এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

বককে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই জলাশয়ের সন্নিকটে, ধানের ক্ষেতে। খানাডোবা ঝোঁপ ঝাপের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন মুনির মত নিশ্চল ভাবে সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, আহার্য্য বস্তু সম্মুখীন হইলেই সহসা তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। সে তৎক্ষণাৎ গ্রীবা বাড়াইয়া হয়ত দুই এক পা অগ্রসর হইয়া তাহার চঞ্চুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগদ্বারা অপেক্ষাকৃত বড় বড় শিকার বিদ্ধ করিয়া ফেলে অথবা স্বল্পায়তন মৎস্য ভেক মুষিকাদি একেবারে গলাধঃকরণ করিয়া দুই এক গণ্ডূষ জল পান করে। বকের এই হিংস্র স্বভাবটাই কেবলমাত্র যাহাদের চক্ষে পড়ে, তাঁহারা স্থির করেন যে, বক বড় অপকারী জীব। কিন্তু তাহার অপকার করিবার ক্ষমতার একটা সীমা ত আছেই, এমন কি আপাততঃ যাহা অপকার বলিয়া মনে হয় তাহাও অনেকটা আমাদের বুঝিবার ভুল। বক সন্তরণ করিতে জানিলেও গভীর জলাশয়ে সাঁতার দিয়া অথবা ডুব দিয়া মৎস্য ধরিবার চেষ্টা আদৌ করে না। তবে স্বল্পতোয় জলা-ভূমিতে সে মৎস্যের অন্বেষণ করে, সুতরাং সে যে খুব অধিক সংখ্যায় মৎস্য সংহার করিয়া

থাকে ইহা মনে করা ভুল। মাছের শত্রু অনেক ;—বোধ করি আমরাই সব চেয়ে বড় শত্রু। এই জন্ম মৎস্যাহননজনিত ব্যাপার লইয়া বককে দোষী করিলে চলিবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে মৎস্য তাহার বিবিধ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে অন্যতম,—সরিসৃপ, ভেক, মূষিক, ছুঁচো, কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক গুগ্‌লি, ঝিনুক, পোকামাকড়, পতঙ্গ, কেঁচো, জোঁক, পাখীর ছানা প্রভৃতি কত কি যে সে ভক্ষণ করে তাহার হিসাব রাখা কঠিন। অতএব যদি কেহ বলেন যে বক প্রধানতঃ মৎস্যাসী এবং সেই জন্য মানুষের পক্ষে বিশেষ অপকারী, সে কথা আমরা অবাধে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। দেখিতেছি যে আমাদের দেশের পুসা কৃষিকলেজ হইতে মিঃ ম্যাক্সওয়েল-লিফ্রয় সম্পাদিত ভারতবর্ষীয় পাখীর খাদ্যসম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটা বকের অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া লেখক মিঃ মেসন্ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধিকাংশ, বক মাছ ব্যাঙ প্রভৃতি স্বল্পতোয় জলাশয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, সুতরাং তাহারা মানুষের উপকারী নহে, তবে দুই এক শ্রেণীর পতঙ্গভুক্ স্থলচর বককে উপকারী বলা যাইতে পারে।" স্থানবিশেষে কয়েকটা মাত্র পাখী দেখিয়া এইরূপ অভিমতপ্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার সাপেক্ষ। ইঁহারা হয়ত দেখিলেন যে অন্ত্রমধ্যে যে সকল কীটপতঙ্গের ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেল তাহাদের মধ্যে অনেকগুলা সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে উপকারী, অতএব তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মানুষের অপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু অন্যত্র জলাশয় প্রান্তর মধ্যে অপকারী কীটাদির বাহুল্য বশতঃ বকের পাকস্থলীর মধ্যে অধিকসংখ্যক উক্ত মন্দ কীট দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ভক্ষিত কীটের প্রতি কেবল মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া বকের স্বভাব সম্বন্ধে পাকা মত প্রকাশ করা এখনও পর্য্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আর মাছ সাধারণতঃ ঋতু বিশেষে এত অপর্য্যাপ্ত ডিম্ব প্রসব করে যে বকের শত্রুতাসাধন সত্ত্বেও মৎস্য জাতির বিশেষ কোনও সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব শুধু এই ব্যাপারের আলোচনা প্রসঙ্গে বকের economic value সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা একটু ইতস্ততঃ করি।

কারণ, এই economic মূল্য যাচাই করিতে হইলে আরও অনেকগুলি বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সম্প্রতি একখানি সাময়িক পত্রিকায় জনৈক লেখক মিসর দেশে তুলার চাষ ও বকের যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসী মানব-সমাজের জন্য বকের পালক এত অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে মিসরে দেখা গেল যে তথায় Egret বক প্রায় লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন গভর্ণমেণ্টের জনৈক বিশেষজ্ঞ গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া প্রচার করিলেন,—যে কীটে তোমাদের তুলার চাষ নষ্ট হয় সেই কীটকে এই বকেরা বিনাশ করে। পয়সার লোভে যাহারা ইহাকে বধ করিয়া ইহার পালক সংগ্রহ করে তাহারা দেশের অর্থ শোষণ করে। তোমরা একবার এবিষয়ে দৃষ্টিপাত কর।" ইহাতে সুফল ফলিল। দুই বৎসরের মধ্যে তথাকার চিড়িয়াখানার কয়েকটি পালিত বক হইতে প্রথমে পনরটি শাবক পাওয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এই পনরটি বক হইতে গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে পাঁচ হাজার Egret বক জন্মলাভ করিয়া এখনও জীবিত আছে; এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সেই পনরটি বকও এখন পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে ক্ষুদ্র বকের উপনিবেশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এখন সেখানে প্রায় দুইলক্ষ বক বিচরণ করিতেছে। এই দুই লক্ষপাখী গত বৎসরে তুলার কীট ধ্বংস করিয়া দুই কোটী টাকার তুলা রক্ষা করিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে শুধু তুলার দিক হইতে এই বকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যেকটির বাৎসরিক utilityর অন্ততঃ দশ টাকা দাঁড়ায়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ (Charles Waterton) বহুপূর্ব্বেই বকের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার

অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি পুকুর ছিল; তাহাতে তিনি মাছ ছাড়িয়াছিলেন। নিকটস্থ একটা ছোট নদীর পাড় হইতে কতকগুলা বড় বড় মূষিক মাটির ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া পুকুরে প্রবেশ করিত। এইরূপে চারিদিকে বড় বড় গর্ত্ত করিয়া সেই মৎস্যাধার জলাশয়গুলার এমন অনিষ্ট করিল যে তিনি মনে করিলেন যে সমস্ত জল বাহির করিয়া না ফেলিলে পুকুরও রক্ষা হইবে না মাছও রক্ষা হইবে না। জল বাহির করিয়া ফেলা হইল, কিন্তু মূষিকের উৎপাত কমিল না। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বক আসিয়া বাসা বাঁধিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর প্রায় অদৃশ্য হইল।

আমাদের বাংলা দেশে অনেক নদীর বাঁধ আছে, এবং সেই বাঁধ থাকার দরুণ অনেক গ্রাম রক্ষা পায়। সেই বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে কর্কটাদি (Crustacian) জীব সেই বাঁধের ভিতর গর্ত্ত করিতে থাকে। যদি তাহা যথাকালে নিবারিত না হয় তাহা হইলে বিষম অনিষ্টের সম্ভাবনা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জলাশয় সান্নিধ্যে প্রায়ই বকের আবির্ভাব হয়, এবং কর্কট প্রভৃতি সংহার করিতে বকের মত আর কেহ পটু নয়।

এমনই করিয়া বক মানবশত্রুর উচ্ছেদ সাধন করে। সে যে মানুষের কোনও অনিষ্ট করে না একথা বলিতেছি না কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আবার বকেরও অনেক শত্রু আছে যাহারা সর্ব্বদাই তাহার প্রাণসংহারে অথবা ডিম্ব নষ্ট করিতে উদ্যত,—মানুষ তাহাদের অন্যতম, বোধ হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান। অতএব ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে হিংস্র ও অপকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার উপকারিতার মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

আবার গবাদি পশুর সহিত বকের সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া দেখিলে কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে বকের উপকারিতা যে কত অধিক তাহা বুঝাইতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না। আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে গোমহিষের গায়ে এক রকম পোকা হয়, যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়া দাড়ায়। তাহারা নানা প্রকারে সেই কীট হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে। বক অথবা কাক সেই পোকাগুলাকে যেরূপে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। এইরূপ কীটের অত্যাচার হইতে বক শূকরকে ও হস্তীকে রক্ষা করে। পশুর রক্তশোষক জোঁককেও বক নষ্ট করে। গরু, ভেড়া মাঠের উপর দিয়া চলিবার সময় যে সকল পতঙ্গ ভূমি হইতে উদ্ধে উঠে, বক তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই খাইয়া ফেলে। এই পতঙ্গ, আমাদের ক্ষেত্রে শস্যগুলার মহা শত্রু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বক ব্যাঙ খায়। কেহ কেহ মনে করেন যে এই ভেকনাশ ব্যাপার মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, কারণ ভেক যে সকল কীট ভক্ষণ করে তাহাদের অধিকাংশই অপকারী। সে সকল কীট বহুল পরিমাণে প্রশ্রয় পাইলে আমাদের বাগান প্রভৃতি নষ্ট করিতে পারে। অতএব ভেক কতকটা আমাদের বাগান রক্ষা করে। তাহাকে সংহার করা কিছুতেই আমাদের পক্ষে শুভ নহে। এসম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ জীবতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে, এখন পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা যে ভেকের কোনও উপকারিতা আছে কিনা। ভেক যে সকল কীট ভক্ষণ করে তাহার অধিকাংশই বিশেষ অপকারী কিনা সন্দেহ। অতএব ব্যাঙ খাওয়ার দরুণ বককে মানুষের শত্রু সাব্যস্ত করা ঠিক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে চাহি, বক-জাতীয় কোন কোন পাখী মানুষের অনিষ্ট করে বলিয়া, যে সকল বকই অপকারী তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না,—অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত আমাদের যতদূর বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরীক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহভাবে বকচরিত্রের কলঙ্ক সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে না।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

(১৭)

রুশদেশের কৃষিজীবিগণ ধর্ম্মপ্রাণ, টলষ্টয়ের এই সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের জন্মভূমি রুশদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা স্বদেশানুরক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বার্থত্যাগী, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের প্রধান গুরু বাকুনীন (Bakounine), ক্রোপোট্‌কিন (Kropotkin) ও টলষ্টয় (Tolstoi) তিন জনেই রুশদেশে অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনজনই নির্য্যাতন মাথায় তুলিয়া নিয়া, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা জীবনে প্রচার ও পালন করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের জানুয়ারী মাসে একবার ও ১৮৫১ সালের মে মাসে আর একবার বাকুনীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। কোনবারই প্রাণনাশের হুকুম তামিল হয় নাই বটে, কিন্তু সাক্সনী, অষ্ট্রিয়া ও রুশদেশের কারাগারে বাস করিতে করিতে প্রাণনাশ অপেক্ষা ভীষণতর যন্ত্রণা, স্বাস্থ্যনাশ, তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা হইতে বাকুনীন ভ্রষ্ট হন নাই। অরাজক-সমাজ-বাদীদের কথা ছাড়িয়া দি। ও দলের সহস্র সহস্র যুবক, অনলে পতঙ্গের ন্যায়, রাষ্ট্রশক্তির তীব্র প্রকোপে ঝাঁপ দিয়াছিল। রাষ্ট্রবাদী বিপ্লব-পন্থী (Revolutionary) বোল্‌শেভিক্ দলের লেনীন (Lenine), ট্রট্‌স্কী (Trotzky) প্রভৃতি নায়কগণের মধ্যে কারাবাস বা নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করেন নাই এমন কেহ নাই বলিলেই হয়। শুধু বিপ্লব-পন্থিদের কথা বলিতেছি কেন, সংস্কার পন্থিগণও (Gradualists, Liberal) মাতৃভূমির সেবায় স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারাও কারাবাস ও নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় পাতিয়া নিয়া স্বদেশসেবা করিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে রুশদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ স্বদেশানুরক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বার্থত্যাগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কি শ্রমজীবী, কি কৃষিজীবী, কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক—প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিতা বর্জ্জন তাহারা জীবনে পালন করিতে পারে নাই। এ কথায় এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, কাহারও মনে প্রীতি ছিল না বা কেহ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করে নাই। প্রীতি প্রণোদিত হইয়াই হউক, বা দ্বেষ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, সময়ে সময়ে সহকারিতা বর্জ্জন অনেকেই দলে দলে করিয়াছে।

সকল অবস্থায় বল-বিজয়ী প্রেমের অনুজ্ঞা পালন করিতে না পারিবার কারণ মানুষের প্রকৃতিতেই নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে সকল মানুষের প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই আছে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ইহার অর্থ এ নয় যে, আমার প্রকৃতিতে দেবভাব আছে ও তোমার প্রকৃতিতে পশুভাব। আমার

প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই আছে, তোমার প্রকৃতিতেও তাহাই। আমি এখন দেবভাবে পূর্ণ, আবার পরক্ষণে হয়ত পশুভাবে বিচলিত। তোমাতে ও আমাতে দেবভাবের বা পশুভাবের মাত্রার তারতম্য নাই, এমন নয়। তোমাতে ও আমাতে, এদেশের মানুষে ও বিদেশের মানুষে প্রকৃতিগত দেবভাবের প্রকার ভেদও আছে। সকল মানুষে দেবভাব শুধু একই প্রকারের নহে। আবার মানুষের প্রকৃতিতে যে পশুভাব তাহারও প্রকার ভেদ আছে। 'কত মানুষ মাত্রেই ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন, বস্ত্র ও বাসগৃহ অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয়। আর সকল দেশের সাধারণ মানুষের বেলায় ইহাও সত্য যে পুরুষ স্ত্রীসঙ্গঅভিলাষী। এই সব প্রয়োজন লাভ করিবার সময় বাধা পাইলে মানুষের প্রকৃতিগত পশুভাব তাহাকে কি অন্দাজ বিচলিত করিতে পারে, তাহা সভ্য সমাজে বাস করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আরও বলেন যে, শুধু এই কয়েকটা প্রয়োজন লাভ করিতে পারিলেই মানুষ শান্তদান্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইবে, তাহা নয়। মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি আছে। মানুষ প্রতিবেশীর নিকট সুনাম পাইতে চায়। অনেকের মনে আবার অপরের উপর প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আবার প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত করিতেছে। অন্নবস্ত্র লাভ হইলেও এ সকল প্রবৃত্তি মানুষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেয় না। মানব প্রকৃতির এই বিচিত্র গঠনের বিষয় প্রকৃত সরলভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনে আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে মানুষের পশুভাবকে সকল সময়ে তাহার দেবভাবের নিকট নতশির রাখা কি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কোন দেশেই সাধারণ মানবের মধ্যে অজেয় অলৌকিক প্রীতির অপ্রতিহত একাধিপত্য বিস্তার আজও সম্ভব হয় নাই, আর মানব সমাজ হইতে বল বা শক্তির (force) নির্ব্বাসনের এখনও দেরী আছে। যতদিন সমাজ হইতে বল বা শক্তি বিদূরিত না হয়, ততদিন কোনও না কোনও আকারে শক্তিমূলক রাষ্ট্রও সমাজে আসিয়া দেখা দিবে। নতুবা তথায় বল বা শক্তির অত্যাচারের সীমা নির্দ্দেশ কে করিবে?

রুশদেশের ধর্ম্মপ্রাণ কৃষিজীবিগণ ও স্বদেশানুরাগী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ টলষ্টয়ের প্রদর্শিত অলৌকিক অজেয় প্রীতির পথে চলিতে পারিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে দল বাঁধিয়া অসহযোগের পথে চলিয়াছে। প্রীতিপ্রণোদিত হইয়াই হউক বা দ্বেষপ্রণোদিত হইয়াই হউক, রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র লোক একযোগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ সঙ্কল্প পালন করিলে, যে কোনও রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইবে। ভিত্তি একবার শিথিল হইলে সে রাষ্ট্র ছোট খাট ধাক্কাও সামলাইতে পারে না। তখন সে রাষ্ট্রকে ধূলিসাৎ করিতে প্রচণ্ড বল বা শক্তির প্রয়োজন হয় না।

১৯১৪ সালের ২রা আগষ্ট রুশসম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস্ পরম উৎসাহে জার্ম্মাণী আক্রমণ করেন। তারপরে তিন সপ্তাহ রুশ সেনানীর বীরত্ব ও জয়বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইল। ১৯১৪ সালের ২৮শে আগষ্ট টানেনবুর্গে রুশসেনানী জার্ম্মানীর নিকট লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইলেও তাহার পরে সাত মাস কালে রুশসেনানী বিজয় গৌরবে প্রমত্ত ছিল। ১৯১৫ সালের জুন হইতে জার্ম্মানীর গোলাবারুদের ধোঁয়াতে রুশসেনানীর সমরোৎসাহ আর তেমন জ্বলে নাই।

যুদ্ধ সুরু হইবার দুইমাস পরেই লেনীন প্রমুখ একদল বোল্‌শেভিক রুশসেনানীকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দেন। আড়াই বৎসর যুদ্ধের প্রায় দুইবৎসর কাল রুশ-সেনানী যুদ্ধে নিরুৎসাহ। ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে রাজধানী পেট্রোগ্রাডে তখন জনগণ ক্ষুধা-ক্লিষ্ট ও রণক্লান্ত। তখন প্রথমে কারখানায় শ্রমজীবিগণের মধ্যে ও পরে সেনানিবাসে যোদ্ধাগণের মধ্যে অসহযোগ দেখা দিল। ক্রমে ব্যবস্থাপক সভায় সংস্কার পন্থিদের (Liberals) মধ্যে ও অসহযোগ দেখা দিল। সামান্য কিছু রক্তপাতের পর ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বহুকালের পুরাতন রাষ্ট্র বহুধারার স্রোতে ভাসিয়া গেল। অসহযোগ তাহার মধ্যে একটা মাত্র ক্ষীণ ধারা। সহজেই রাজতন্ত্র দূর হইয়া প্রজাতন্ত্র উপস্থিত হইল। তার কিছু পরে ডুমা বা ব্যবস্থাপক সভায় কৃষি-জীবী প্রতিনিধিগণের নায়ক কেরেন্‌স্কী (Keransky) প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের নায়ক হইলেন। নিকোলাসের পালা শেষ হইয়াছে, এবার কেরেন্‌স্কীর পালা। বল বা শক্তির সাহায্যে এক রাষ্ট্র নষ্ট হইল আর এক রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলিল। আবার সেনানিবাস সমূহে অসহযোগ দেখা দিল। এক বিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব আসিল। কেরেনস্কীর নূতন রাষ্ট্র আটমাসও টিঁকিল না। এবার লেনীনের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র আসিল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর এই সমাজতন্ত্রবাদী নূতন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। টলষ্টয় বলিয়াছিলেন, বল বা শক্তির সাহায্যে যে রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহার স্থানে ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাও শক্তি মূলক হইয়া দাঁড়াইবে। শক্তির সাহায্য যদি একবার নিয়াছ, শক্তির সাহায্য তোমাকে চিরকাল নিতে হইবে। নিকো-লাসের শক্তিমূলক রাষ্ট্রের স্থানে আসিয়াছিল কেরেনস্কীর শক্তিমূলক প্রজাতন্ত্র। আবার অসহ-যোগের পথে তাহার স্থানে আসিল লেনীনের শক্তিমূলক বোলশেভিক প্রজাতন্ত্র। তারপরে লেনীনের সেনানিবাসেও অসহযোগ সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে। কিন্তু লেনীনের সেনাশক্তি এখনও প্রবল বলিয়া আজ প্রায় চারি বৎসর বোল্‌শেভিক্ সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র টিঁকিয়া আছে।

সকলেই বলিতেছে যে বোল্‌শেভিক রাষ্ট্র আজও রুশদেশে সমাজতন্ত্র (Socialism) প্রতি-ষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সম্রাটের আমলে ছিল বারকোটি কৃষিজীবী ও একলক্ষ ত্রিশ হাজার ১৩০,০০০ ভূম্যধিকারী ; এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই আজ ভূম্যধিকারী। এই কোটি কোটী ভূম্যধিকারী কিন্তু রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ সম্পত্তি (Private Property) দূর করিয়া দিতে বড়ই নারাজ। ইতি মধ্যেই রুশদেশে কৃষি-জীবিদের মধ্যে একশ্রেণী ধনী ও অপর শ্রেণী দরিদ্র হইয়া দাড়াইয়াছে। সমাজতন্ত্র সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই ; করিবার তেমন অবসর ও পায় নাই। আর রুশদেশে বিপ্লবের ফলে সমাজ তন্ত্রই প্রকৃত পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহারও আলোচনা করিবার এখন সময় আসে নাই। কিন্তু সাধারণ প্রজার স্বাধীনতা যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় নাই তাহা সুনিশ্চিত। নব-সংস্থাপিত রাষ্ট্রে প্রজাদিগদ্বারা রাষ্ট্রের নিয়ম সকল পালন করান রাষ্ট্রের পক্ষে সুসাধ্য নয়। সেই জন্য অনেক নগণ্য সাধারণ প্রজা রাষ্ট্রের নিয়ম অমান্য করিয়াও শাস্তি পায় না। ইহাতে যতটুকু স্বাধীনতা ততটুকু স্বাধীনতা বাড়িয়া থাকিতে পারে। নতুবা প্রজার স্বাধীনতার মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে।৹ নূতন রাষ্ট্রের প্রাণরক্ষার জন্য, যখন ও যেখানে প্রয়োজন, শক্তিমূলক পদ্ধতি

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করিতেছে। বোল্‌শেভিক 'লালপল্টন' (The Red Army) প্রলয়ঙ্করী শক্তির অভিনয় দেখাইতেছে।

অসহযোগের স্বভাব ভাঙ্গা, গড়া নয়। "ভাঙ্গিলে গড়িতে পারে সে বড় সুজন"। অসহযোগ সে "সৌজন্যের" দাবী করিতে পারে না। রুশদেশেও পারে নাই। অসহযোগের অবশ্যম্ভাবী ফল নির্দ্দিষ্ট কাজে লোকের মন বসে না। বারমাস ত্রিশদিন ছুটী পাইবার ইচ্ছা মনে জাগে। বোল্‌শেভিক রাষ্ট্রেও ইহার পরিচয় অতিমাত্রায় পাওয়া গিয়াছে। সম্রাটের আমলে এক নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ পুরুষ কয়েক বৎসরের জন্য সৈনিক হইয়া কাজ করিতে বাধ্য। সে নিয়ম (military conscription) রদ করা হইয়াছে। এখন নিয়ম হইয়াছে যে রাষ্ট্র যত জনকে কাজ দিতে পারিবে ততজনকে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারখানায় আসিয়া শ্রমজীবী হইতেই হইবে (Industrial Conscription)। তারপরে কারখানা ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সৈন্য দল ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে (Desertion) যেমন শাস্তি পায়, কারখানা ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে (Labour Desertion) শ্রমজীবিদের সেইরূপ শাস্তি হয়। এইরূপ কড়া শাসনের ব্যবস্থা করিয়া অতিরিক্ত ছুটির বাসনা খর্ব্ব করা প্রয়োজন হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ জাতির ইতিহাসেও শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করিতে হইতেছে। আবার বলি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি শক্তি বা বল (Force)।

(১৮)

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর পেট্রোগ্রাডে শ্রমজীবী ও সৈনিকদিগের প্রতিনিধি-সঙ্ঘের (soviet of workmen's and soldiers' delegates) অধিবেশনে লেনীন বিপ্লব-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সময় বলেন—"এখন পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমার জ্ঞানমত একজনও হত বা আহত হয় নাই।" তখন কথাটা সত্য ছিল।

তারপর "লাল পল্টনের" অভিনয়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাডে আর এক প্রতিনিধি সভায় (Constituent Assembly) বোল্‌শেভিক দলকে শুনিতে হইল যে চীৎকার উঠিয়াছে—"তোমাদের হাত ভাইয়ের রক্তে মাখা। আর রক্তপাত চাই না।" সভার দক্ষিণ পাশ হইতে যখন এই চীৎকার উঠিতেছিল তখন লেনীন উত্তর দিলেন—"আমরা শক্তির সাহায্যে ভীষণ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, আমরা কবে টল্‌ষ্টয়ের শিষ্য ছিলাম?"

শুধু যে "লাল পল্টন" রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সহস্র সহস্র চোর বা রাষ্ট্রদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্বেষীদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল তাহা নয়। কৃষিজীবিগণকেও ঐ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ভূম্যধিকারিদিগকে জমি হইতে তাড়াইবার জন্য সময়ে সময়ে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল। কারখানার মালিকগণ (capitalists) সব সময়ে বিনা রক্তপাতে "কারখানা কমিটি"র (Factory Committee) হাতে কারখানা ছাড়িয়া দেয় নাই। আবার সকল শ্রমজীবির সমান বেতন হওয়া চাই বলিয়া শ্রমজীবিগণ দাবী করাতে অনেক স্থলে শ্রমজীবিদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাণভয়ে "কারখানা কমিটি" (Factory Committee) পূর্ব্বমালিকদিগের (Capitalists) হাতে ফেরৎ দিতে চাহিয়াছে। অনিপুণ, নিপুণ ও সুনিপুণ শ্রমজীবিদিগের সকলের সমান বেতন

না হইলে যেমন নিকোলাসের শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, যেমন কেরেন্‌স্কীর শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, তেমনি লেনীনের শাসনও বিপর্য্যস্ত করিতে দ্বিধা করিব না—একথাও লেনীনকে শুনিতে হইয়াছে। তারপর আবার লেনীনের "লালপল্টন"—

রাজতন্ত্র গিয়াছে, প্রজাতন্ত্র আসিয়াছে। নিকোলাস্ রোমানোফ্ গিয়াছে, জনগণ-নির্ব্বাচিত লেনীন আসিয়াছে। একলক্ষ ত্রিশহাজার অভিজাত ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তে এখন কোটী কোটী কৃষক ভূম্যধিকারী। ধনী পুরুষ এখন রাস্তায় সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অভিজাত মহিলা শীতকালে রাস্তায় বরফ ঝাঁটাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। শ্রমজীবিদের মধ্যে কেহ কেহ মাসে দশহাজার রুব্‌ল্ (Rouble) উপার্জ্জন করিতেছে। সম্রাটের আমলে যাহারা রাস্তায় রাত্রি যাপন করিত, তাহারা অনেকে এখন বোল্‌শেভিক রাষ্ট্রের নিয়মানুসারে অভিজাতের প্রাসাদে নিদ্রা যায়। কিন্তু বৈষম্য আজও দূর হইল না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আজও রুশদেশে সহস্র সহস্র নিরুপায় লোকের প্রাণনাশ করিতেছে। প্রতিপত্তিশালীর অত্যাচার আজও দূর হয় নাই।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

নিঃসঙ্গের স্বপ্ন।

মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ঝা বিশ্ববক্ষোপরে
রুদ্র-তাণ্ডবের হেন মথি' চরাচরে
বয়ে' গেছে অকস্মাৎ! সপ্ত সিন্ধুনীর
আন্দোলি আস্ফালি গর্জ্জি উচ্ছ্বাসি গভীর
উন্মত্ত দানব প্রায় প্লাবি' দশদিশ
ধরিত্রীর শ্যাম-শোভা হায় জগদীশ!
নিঃশেষে মুছিয়ে গেছে! ঘুচে গেছে আজ
বিপুল সংসার সাথে দুঃখ দৈন্য লাজ
প্রাণের বন্ধনরাশি! পাখী নাহি গায়
বহে না সমীর আর চেতনা-বন্যায়
মাতায়ে চৌদিক হর্ষে! স্তব্ধ চারিধার
শব্দহীন অচঞ্চল কূটস্থ আত্মার
বিকল্প সমাধি সম!
　　　　একাকী কেমনে
আমি শুধু পড়ে আছি বিশাল ভুবনে
কালের সাক্ষীর মত, মহাশূন্যতায়
পূর্ণ করি, ম্লান ভাবে! হেরি ক্ষিপ্ত প্রায়
সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে উভ পার্শ্বে মম
দুস্তর অনন্ত শুধু রুদ্র রোষ সম
আমারে ঘেরিয়া আছে! ক্ষুদ্র শান্ত আমি
অনন্তের পারাবারে ডুবি দিন-যামি
হইতেছি রুদ্ধ-শ্বাস! এত নীরবতা
সীমাহীন দিগন্তের নিঝুম স্তব্ধতা
অসহ্য আমার পাশে! গুমরিয়া প্রাণ
মরিতেছে মুহুর্মুহুঃ। করিছে সন্ধান
স্বধর্ম্মী কোথায় আছে! নাই, কেহ নাই,
ভীষণ সংহার-দৃশ্যে পূর্ণ দশ ঠাঁই
বিরাট শ্মশান হেন।
　　　　হে শ্মশানেশ্বর!
হে বিশ্ব-প্রলয়-পতি ত্রিশূলী শঙ্কর!
একি ভ্রান্তি তব নাথ! সব গেছে হায়,
বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে প্রলয়-বাত্যায়
ধূলিরেণু সম উড়ি' সাগর উচ্ছ্বাসে
ভাসি' তৃণখণ্ড প্রায়। শুধু তব পাশে

হয়েছিল ক্লান্ত বড় দুর্ভাগ্য অক্ষমে
মথিতে সে ঘূর্ণিচক্রে। একদা অধমে
নিষ্ঠুর জগৎ যথা ক্ষণেক ফিরিয়া
চাহিত না হেলা ভরে, পাছে না ভাবিয়া
তার সাথে মৃত্যু কিবা করে পরিহাস
তেমতি উপেক্ষি হায়। সে কি মৃত্যু ত্রাস
তব সম মৃত্যুঞ্জয়।
ক্ষম ক্ষমাময়।
বৃথা দুষিতেছি তোমা। নিঃসঙ্গ হৃদয়
একান্ত সন্তপ্ত আজি! অভিশপ্ত প্রাণ
ভুঞ্জে কর্ম্মফল নিজ। বাজাও ঈশান।
ভৈরব বিষাণ তব ব্যোম হতে ব্যোমে
তুলি' ঘোর প্রতিধ্বনি, কোটি সূর্য্য-সোমে
রোমাঞ্চিয়া যুগপৎ! নাচ চন্দ্র চূড়।
সে মহা নির্ঘোষ-তালে চির-মূর্চ্ছাতুর
তমাচ্ছন্ন চিত্তে মম অপূর্ব্ব-মধুর
মদোন্মত্ত ভঙ্গিমায়! হয়ে যাক্ দূর
সব শ্রান্তি অবসাদ। ত্রস্তে মুছে আঁখি
চেয়ে দেখি সবিস্ময়ে নহিরে একাকী
কি আনন্দ স্বপ্নাতীত। সব্ব শেষে আজ
তুমি আর আমি শুধু আছি বিশ্বরাজ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বৈষ্ণব কবিতা।*

বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিতা গীতি কবিতা অর্থাৎ lyrics নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বাঙ্গলার বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ গীতি-কবিতা কাহাকে বলে, তাহা দেখা আবশ্যক। গীতি-কবিতা ইয়োরোপীয় নাম। পূর্ব্বে আমাদের দেশের কবিতা, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য অথবা দৃশ্যকাব্য, এই তিন পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। ইংরেজী আমলে খণ্ড-কাব্যের অন্তর্গত কতগুলি কবিতাই গীতি-কবিতা নামে অভিহিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনের ভাবোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট রূপ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই গীতি-কবিতার সৃষ্টি। এই সকল কবিতার গীতি-কবিতা নাম প্রাপ্ত হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ গীত হইবার উদ্দেশ্যে তৎসমুদায়ের রচনা হইত। গীত হইবার উদ্দেশ্যে যে কবিতা তাহার সাফল্য জন্য সুন্দর শব্দ বিন্যাস, ও সুশ্রাব্য ছন্দোবন্দন ও সুমধুর কণ্ঠধ্বনি আবশ্যক। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, শব্দ ঝঙ্কৃত কবিতা গীত না হইয়, কেবল পঠিত হইলেও মনমুগ্ধ করে। ফলতঃ এখন ছন্দগ্রথিত ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতা মাত্রেই গীতিকবিতা নাম লাভ করিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, গীতি-কবিতার সাফল্যের জন্য শব্দ ও ছন্দ আবশ্যক। কিন্তু শব্দ ও ছন্দই গীতিকবিতার সর্ব্বস্ব নহে। রস এবং সৌন্দর্য্যই গীতি কবিতার প্রাণ।

রস কাহাকে বলে? যে বর্ণনা দ্বারা অভিলষিত পদার্থে প্রগাঢ় প্রেম, প্রিয়-বিয়োগ-জনিত চিত্ত-বিহ্বলতা, কর্ম্মে অবিচলিত উৎসাহ এবং রাগ দ্বেষ বিমুক্ত মন প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয়, তাহাই রস সঞ্জাত। যে গীতিকবিতায় এই রসোদ্ভাবন হয়, তাহা পাঠে হৃদয় কখনও হর্ষে উছলিতে থাকে, কখনও শোকে দহিতে আরম্ভ করে, কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে

---

* টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঠিত। এই সভায় শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার কখনও ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। আর সৌন্দর্য্য ? এই রসোদ্ভাবন হইতেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রেমিকা আক্ষেপ করেন,

লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁ ও হিয় জুড়ন না গেল।

তিনি প্রার্থনা করেন,

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈও তুমি।

তিনি অভিলাষ করেন,

(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ

প্রেমিক বলেন,

চম্পক বরণী হরিণ নয়না
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

আবার

তাকায়ে মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ

প্রেমিক প্রেমিকা

দোঁহ কোড়ে দোঁহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

মাতা পরাণপুতলীকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া বলেন

এতক্ষণ কোথা, হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ঘর, গৃহ মাঝে ছিল,
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।

বালক সখা,

যেই ফল মিষ্ট লাগে, অমনি দেয় শ্যামের বদনে,
আবার বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় বলেন

নাবল নাহক ওসব কথা
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুড়ায় অন্তর,
অধিক জ্বলিয়া উঠে।

প্রেমিক প্রেমিকার এই প্রেম, মাতার এই স্নেহ, সখার এই অনুরাগ মনোরম, এই সকল

ভাবের সন্নিপাতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা আমাদিগকে আনন্দে আপ্লুত করে, আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহা মানবের অন্তঃসৌন্দর্য্য।

ঐ অন্তরের সৌন্দর্য্য আপনা আপনি ফোটে, কবির ইন্দ্রজালে তাহা শব্দ ও ছন্দের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু রস কি মাত্র নয়টি? মানব প্রকৃতিতে ভাবের অসীম খেলা, কত বৈচিত্র্য, কত রূপ, কত বর্ণ, কত গন্ধ, কে তাহার গণনা করিবে? মানুষ কি, জগতের মাঝে মানুষের স্থান কোথায়, সৌন্দর্য্য, ভালবাসার সহিত মানুষের সম্পর্ক কি, এই সকল ভাব মানুষের চিত্তে প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত মথিত করিয়া এক অব্যক্ত পরমরূপ, পরম রস উছলিয়া উঠিতেছে। তাহাতে কবিচিত্ত স্পন্দিত হয়; তিনি যে অনুভূত রূপ এবং রস ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কমনে আসে যায়।" "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।" এই খোঁজে তিনি ইন্দ্রিয় মন, আত্মা, সান্ত জড়ত্বের সীমার অতীত উর্দ্ধতর লোকে উন্নীত করিয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া দেন। ইহাতে অরূপের রূপ লীলায় কত গান, কত ছন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমস্তই দূরাগত সুকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত লহরীর মত মিষ্ট ও প্রীতিকর, হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়, কিন্তু ধরিবার বুঝিবার নহে।

এই যে ভাবের প্রবাহ, তাহা চিরকাল কবিচিত্ত স্পন্দিত করিতেছে। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক কবিকুলের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রাচীন কবিকুল যেভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহারা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত করিতেন, তাঁহারা মনের ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া তাহার ঘনীভূত রূপকেই ভাষায় বাহির করিতেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ও আছে, যথা রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান, এই সমস্ত জটিল ও অস্পষ্ট। আধুনিক কবিবৃন্দ আপনাদের মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠে, তাহা সংযত করিতে অভ্যস্ত নহেন; যাহা কিছু দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত স্পন্দিত হয়, তাহাই তাঁহারা পরিপাটী ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক কবিতার অধিকাংশই অস্পষ্ট সহজ বোধ্য নহে। প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য আছে বলিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাহাদিগের কবিতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, প্রাচীন কবিতা (Classical poetry) এবং আধুনিক কবিতা (Romantic poetry) আমাদের বক্তব্য এই যে উভয় শ্রেণীর কবিতাই আমাদের প্রিয়। প্রাচীন কবিতার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের স্পষ্টতা এবং আধুনিক কবিতার ভাষার পরিপাট্য ও ভাবের উচ্ছ্বাস, সমস্তই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

গীতি কবিতার কবি অন্তরের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বাহ্য দৃশ্যে যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট, তাহার চিত্রও অঙ্কিত করেন। কবির বাহ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ আমরা দেখাইতেছি। ঐ প্রশস্ত সমতল ভূমি শস্য শ্যামল হইয়া শোভা পাইতেছে, বিজন বনরাজি গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমি সূর্য্য কিরণে জ্বলিতেছে, পর্ব্বত মালা একটীর পর আর একটী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে, বিপুল কায়া স্রোতস্বিনী কলনাদে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, প্রস্রবণ ধারা পর্ব্বত গাত্রে আহত হইয়া স্ফটিক চূর্ণের মত পড়িতেছে।

বাহ্য দৃশ্যের আর এক সৌন্দর্য্য,—ঐ গৃহস্থ বধূ বাঁকা পথে কলসী কাঁখে চলিয়াছে। বামেতে শুধু মাঠ ধূ ধূ করিতেছে দক্ষিণে বাঁশবন শাখা হেলাইয়া রহিয়াছে, দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা দীঘির কালজলে সাঁঝের আলো ঝলিতেছে, তীরে অমিয় মাখা স্বরে কোকিল কুহরিতেছে। আঁধার তরু শিরে চাঁদ আকাশ আঁকা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমা মজুরের ছোট মেয়ে ঘটিবাটি থালা লইয়া ঘষামাজা করিতেছে, পিত্তলকঙ্কণ পিতলের থালি পরে ঠন ঠন বাজিতেছে, নেড়া মাথা, কাদা মাখা, উলঙ্গ ছোট ভাইটি দিদির আদেশে পোষা প্রাণীটীর মত উচ্চ পাড়ে স্থির ধৈর্য্যভরে বসিয়া রহিয়াছে। *

কবি গীতিকবিতায় এইরূপ নানা ছবি অঙ্কিত করেন। তাঁহার তুলিকাস্পর্শে এই সমস্ত শোভা এই সমস্ত সৌন্দর্য্য শব্দ ও ছন্দের মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

গীতি কবিতার রস ও সৌন্দর্য্য বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহা দেখাইলাম। এই রস ও সৌন্দর্য্য ভাষার মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া মানস নয়নে দেখা দেয়। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল হইবে, তাহার ভিতর দিয়া রস ও সৌন্দর্য্য দেখা যাইবে। সুন্দর ভাব সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ ভাব ও ভাষা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

গীতি কবিতার এই সমস্ত লক্ষণ ধরিয়া বৈষ্ণব কবিতার বিচার করিতে হইবে। বৈষ্ণব কবিতা উৎকৃষ্ট, উপভোগ্য, তাহার ভাষা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, আর তাহার ভাব আকুল করে প্রাণ। বৈষ্ণব কবির ভাষা স্বচ্ছতরল স্রোতধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, জীবনের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত, মুখরিত। এইভাষা কোথাও হর্ষে গদগদ ভাষিণী, কোথাও দুঃখে অশ্রুময়ী, কিন্তু সর্ব্বত্রই কুসুমিত কলেবরা।

বৈষ্ণব কবিতা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদ। রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান দেহতত্ত্ব এবং সাধন বিষয়ক এবং একই শ্রেণীভুক্ত। এই পদ ও গান অস্পষ্ট, অর্থ পরিগ্রহ দুষ্কর। দুই কারণে এইরূপ হইয়াছে। এই সকল সাধকের হৃদয়ে যে ভাবরাজির খেলা হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট, মৃগ কস্তুরীর গন্ধে মোহিত হয়, কোথা হইতে সে গন্ধ আইসে, কিসের গন্ধ, তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। এই সকল সাধক ও সেইরূপ আপনাদের হৃদয়ে অস্পষ্ট ভাব অনুভব করিয়াছেন, সে অনুভূতিতে তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সে সমস্তের মূর্ত্তি প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এজন্য তাহাদের পদ ও গান অস্পষ্টতা দোষ যুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সহজ ভজনের কথা বলা হইয়াছে। এই ভজনকথা বহিরঙ্গকে বলা নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, ঐ পথের পথিক ভিন্ন অন্যে সবটুকু বুঝিতে না পারে। টীকাকারেরা এই ভাষাকে "সন্ধ্যা ভাষা" অর্থাৎ আলো আঁধারের ভাষা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অর্থাৎ চৈতন্য পন্থীরা সহজ ভজনকে রসের ভজন বলেন। তাহাদের মতে চণ্ডীদাস প্রভৃতি, "পঞ্চরসিক" সহজ মতের প্রবর্ত্তক। চণ্ডীদাস একজন বাউল ছিলেন এবং তাঁহার রাগাত্মিক পদ প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে সহজ ভজন চণ্ডীদাস অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া দেখা যায়। মহামহো-

* চন্দ্রিকা।

পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সহজ ভজন অথবা সহজ যান পথ বৌদ্ধদিগের সৃষ্টি। বুদ্ধদেবের পবিত্র নির্ম্মল ধর্ম্মের অধোগতি হইলে বৌদ্ধেরা সে ধর্ম্মকে "সুখবাদে" পরিণত করিয়া ভোগের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাই সহজ ভজন অথবা সহজ যান।

এখন আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী সম্বন্ধে লিখিতেছি। পদাবলীর প্রকৃত রস গ্রহণ করিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। ভিতরে প্রবেশের চাবি আছে। এই চাবি সকলের পক্ষে সুলভ নহে। তজ্জন্য ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে বৈষ্ণব পদাবলী যে ভাবে দেখা যায় তাহাই আমরা প্রথমে বলিয়া লইতেছি। স্ত্রীপুরুষের প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, প্রতি অঙ্গলাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ।

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গলাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে

*   *   *

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা

রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরিতৃপ্তির যে বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই সাতিশয় অশ্লীলতা দুষ্ট, ইহা অনেক স্থলে এরূপ অশ্লীল যে, পতি পত্নীতে ও এক সঙ্গে বসিয়া পাঠ করা কঠিন। এই সকল স্থানে দেহ বৃত্তি স্বপ্রকাশ এবং ব্যর্থ লালসাজাত মান অভিমান উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সম্ভোগ কামুকের দৈহিক মিলন হইতে উচ্চে। কামুকের ইন্দ্রিয় সম্ভোগে দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ অবসাদ আসিয়া থাকে। এখানে অবসাদ আইসে নাই। পক্ষান্তরে তাহা হইতে প্রেমের অপূর্ব্ব প্রগাঢ়তা এবং আত্মবিসর্জ্জন উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রেমও আত্ম বিসর্জ্জনের চিত্র অতি উজ্জ্বল, মনোজ্ঞ ও প্রীতিকর।

নায়ক শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অতি কোমল, তিনি প্রীতিদ্বারা পশু পক্ষীকেও বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোঠে গোবৎস হারাইয়া অধীর হইয়া মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করেন। এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি নয়নে গলায় ধারা। তাঁহার বাঁশীর স্বরে গাভীকুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, দুগ্ধ স্রাবি পড়ে বাটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে। স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একদিন নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমক চাহিয়া গেল। সে রূপরাশি তাঁহার পাঁজর কাটিয়া হিয়ার ভিতরে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার সমস্ত কলেবর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল, তিনি রাই রাই করি ফুকরি ফুকরি ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রতিক্ষণেই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, চন্দ্র দিবা ভাগেই হীনহীন অর্থাৎ কান্তি সৌন্দর্য্য বিরহিত থাকে, কিন্তু রজনীতে নিজের বিলুপ্ত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দিবারাত্রি উভয়ই সমান; তিনি ক্রমেই অধিক কৃশ ও মলিন হইতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গুরীয় হাতে বালার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তিনি অর্দ্ধেক বাক্য কহেন, তাহার নেত্র দুইটী ঝরণার মত (অবিশ্রান্ত) ঝরিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ

মানুষ চিনিতে অসমর্থ, চোখে নিমেষ নাই, কাঠের পুতুলির মত চাহিয়া রহিয়াছেন, নাকের আগে তুলা ধরিলে তাহা ক্ষীণ শ্বাসে কম্পিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে তাহার জীবন আছে বলিয়া বুঝা যায়।* তাদৃশ গভীর মর্ম্ম পীড়ার পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইলেন, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমিখে কতশত বার
নিমিখে হইয়ে হারা।

তারপর আবার বিরহ। এই বিরহে দগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

হাতদিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ অনল॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হ'ল সলি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বরাই যমুনার কূলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে॥
মরিবার বেলে রাধা সোঁওরাও রাধা।
জনমে জনমে যে মিলায় বিধাতা॥

নায়িকা শ্রীমতীরাধিকা এই প্রগাঢ় প্রেম ও তন্ময়তার কিরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন আমরা এখন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ কোটি চাঁদ জিনি ঘটা, ধনীর রূপের ছটা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন,

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্ব কানন হৈতে।
তারপর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥

তারপর দর্শন লাভ। সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকনা দেহা। রাধা এই রূপ দেখিয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি। শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের অভিলাষে পুনঃপুনঃ ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, কিন্তু লজ্জা ও আশঙ্কায় তখনি আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। মন চঞ্চল হইয়াছে, তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং যে কদম্ব কাননে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সুখ ঘটিয়াছে,—সেই কদম্ব কাননের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন। শ্রীমতী রাধা এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের পথ দিয়া যাইতেছেন

* পদকল্পতরু (শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়)

ভাবিয়া পুনঃপুনঃ চমকিয়া উঠেন এবং প্রিয়তমের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে যাইতেছেন মনে করিয়া অলঙ্কার পরিতেছেন। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় একাকিনী গহন কুঞ্জে গমন করিতেছেন এবং সেখানে তাহার দর্শন না পাইয়া ভূতলে লুটাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া তামালতরুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছেন। নবানুরাগের প্রাবল্যে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে তন্ময়তা জন্মিয়াছে। তাই তাহার নেত্রদ্বয়ে শ্যামরূপ, বাক্যে শ্যাম নাম, অঙ্গে শ্যাম বসন, কণ্ঠে নীলপুষ্পের কিংবা নীলরত্নের হার এবং হৃদয়ে শ্যামমণি বিরাজ করিতেছে এবং তিনি কোন শ্যামবর্ণা সখিকে আলিঙ্গন দান করিতেছেন। শ্রীরাধার বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ শ্যাম নাম স্মরিতে স্মরিতে অর্থাৎ শ্যামের ধ্যানে থাকিয়া শ্যাম হইয়াছে। ইহার পর মিলন, কিন্তু মিলনেও শ্রীরাধার সুখ নাই। * শ্রীকৃষ্ণ তাহার এত প্রিয় যে, সদাই হারাই হারাই মনে হইতেছে। রাধার ভয়, পাছে নিদ্রায় অচেতন হইলে শ্যামকে বিস্মৃত হন, তাই সারা নিশি জাগিয়া থাকেন। (১)

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

বৈষ্ণব কবি নায়ক নায়িকাকে এইরূপ প্রেম বিহ্বল, তন্ময় ও আত্মবিস্মৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল কবির তুলিই যে সমভাবে তাদৃশ সৃষ্টিনিপুণ, আমরা তাহা বলিতেছি না, আমরা কেবল একটা আদর্শ দেখাইতেছি।

বৈষ্ণব কবির সৃষ্টি ক্ষমতা কেবল নায়ক নায়িকার চিত্র অঙ্কনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাহারা মাতার স্নেহ এবং সখার অনুরাগ ও অঙ্কিত করিয়াছেন সে সকল চিত্রও মনোরম। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য, কারণ মধুর রসে অন্যান্য রসেরও অস্তিত্ব আছে এবং এই রসভুক্ত আত্মবিসর্জ্জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য বৈষ্ণব কবি মধুর রসের চিত্র অঙ্কনেই প্রায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি নায়কনায়িকাকে প্রেমে বিহ্বল, তন্ময় ও আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহারা সাহিত্যের বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা এই বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি।

ধীশালী উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহোদয় নায়কনায়িকাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে নায়কনায়িকা সমাজ ও নীতি উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়কনায়িকা তাহারা, যাহারা সমাজের বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, কিন্তু নীতির মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল থাকেন। সমাজ ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নায়কনায়িকা অধম। আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা এই যে, স্ত্রীপুরুষ একবার বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হইলে তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই, স্ত্রী আমরণ বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে বাস করিবেন, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

* পদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায়)

(১) চণ্ডীদাসের পদাবলী (নীলরত্ন মুখোপাধ্যায়)

হইলেও তাহার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার পথ রুদ্ধ। তিনি যে কেবল পতির জীবদ্দশাতেই পত্যন্তর গ্রহণে অসমর্থা, তাহা নহে; পতির মৃত্যুর পরও তাহার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা এইরূপ সমাজের নায়কনায়িকা। রাধিকা অন্যের বিবাহিতা পত্নী, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন। এই মিলনে সমাজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই সমাজের আচার লঙ্ঘন দূষনীয় নহে। যদি কেহ বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন অথবা তাদৃশ প্রয়োজনবোধে কোন বিধবার পাণি গ্রহণে অগ্রসর হন, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার কার্য্যের মূলে সামাজিক সাম্য বোধ এবং পরদুঃখে সমবেদনা রহিয়াছে। ফলতঃ ঐ কার্য্যে সমাজের দোষ সংশোধনের প্রয়াসরূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নাই, তিনি যদি কোন বিধবার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হন, তবে তাহা লালসা জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ঐ কার্য্য কখনও নীতিবিরুদ্ধ নহে। বাস্তবিক কোন কার্য্যে সামাজিকতা বিরুদ্ধ হইয়াও নীতিবিরুদ্ধ না হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায় যে, রাধা বাল্যকালে অন্যের ইচ্ছায় একজন ক্লীবের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে একরূপ বিধবা বলা যাইতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন নীতি বিরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যৌন সম্বন্ধ বৈধ করিতে হইলে বৈবাহিক বন্ধন আবশ্যক এবং এই বন্ধন সমাজের মেরুদণ্ড, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সহিত "সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই কর্ত্তব্যপালনের শত্রুতা নাই। রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে। রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা, শাস্ত্রমতে অনূঢ়া, পরকীয়া হইয়াও পরস্ত্রী নহেন, কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন"। *

কিন্তু এই মত বৈষ্ণবেতর সমাজে কতদূর স্বীকৃত, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিছুদিন পূর্ব্বেও শাক্তমতাবলম্বীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনুকূল নহেন।

এখন আমরা চাবিদ্বারা বৈষ্ণব কবিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি। এই চাবি বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভগবান আনন্দ স্বরূপ। আনন্দের স্বভাব এই যে, উহা ব্যাকুলতা আনয়ন করে। সে ব্যাকুলতা মিলন জন্য। সাধারণ মানবের চরিত্র অনুধাবন করিলেই এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। মানুষ আনন্দ লাভ করিলে নিজ গৃহ কোণে বসিয়া থাকিতে অসমর্থ হয়; সে ছুটিয়া দশ জনের মধ্যে উপস্থিত হয়। অত এব যিনি আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাতে নিত্য কালস্থায়ী এক অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে। একারণ বৈষ্ণবের ভগবান জীবকে দয়া করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত। তিনি জীবের হৃদয় দ্বার সবলে ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। ইহার নাম ভগবৎ কৃপা। তিনি জীবকে কৃপা করিবার জন্য সজলনেত্রে পথে পথে বেড়াইতেছেন। এই যে জীবের প্রতি তাহার অপার কৃপা বিতরণ, ইহার নাম লীলা। মন সংযত, হৃদয় নির্ম্মল, অহঙ্কার দূরীভূত হইলে জীব এই লীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ভগবান লীলাময়। তিনি

---

* নবজীবন (প্রথম বৎসর)।

লীলা প্রকট জন্য দেহধারী হইয়াছেন। ভগবান সর্ব্ব প্রথম নৃসিংহ অবতারে ভক্তের নিকট ধরা পড়েন। লীলায় ভগবানের এই প্রথম প্রকাশ। নৃসিংহদেবের বিকট ভীষণ মূর্ত্তি ভক্ত প্রহ্লাদ সমীপস্থ হওয়ামাত্র মুহূর্ত্তে মধ্যে কুসুম কোমল হইল। তিনি কোমল হইতে কোমলতর হস্তে ভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভগবানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লীলা শ্রীবৃন্দাবনে হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান ব্রজের নরনারীকে কৃপা করিবার জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ব্রজের নরনারী প্রেমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই যে ব্রজলীলা ইহার মধ্যে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধার সহিত লীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণহরে রাধাঅঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখ আমা হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান।
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু না পাই অন্ত॥

আমরা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। রাধা কৃষ্ণের লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজনপূজন প্রণালী সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে।

প্রভুকহে এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

*　　　　*

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা পরস্ত্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবকেও সেই প্রকার ভজন পূজন করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কর্ত্তা ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি,

ভক্তিধর্ম্ম,—দুইরাজ্যে বিভক্ত, শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি গীতার শেষ সীমা, জ্ঞান শূন্যাভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, শ্রীভগবানের এই দুই ভাব, তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, এই গেল তাহার ঐশ্বর্য্য ভাব, তিনি রূপে ও গুণে আকর্ষণ করেন, এই গেল তাহার মাধুর্য্যভাব। গীতায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবে ভজনের কথা লেখা, শ্রীভাগবতে মাধুর্য্য ভাবের ভজনা বিরচিত, গীতা রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মোসলমান ও প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম। শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান নিজ জন; আর নিজরূপে তাঁহাকে যে ভজনা, তাহা দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়। নিজ জন কাহাকে বলে? পিতা কি প্রভু; সখা কিভাই; সন্তান কি পতি, ইহারাই নিজ জন। অতএব এই সংসারে যে চারিটীবস্তু পিতা, সখা, পুত্র, পতি, ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে একজন কর। তাঁহাকে পিতা রূপে অথবা সখা রূপে অথবা পুত্ররূপে অথবা পতিরূপে ভজনা কর। এই যে তোমার বাৎসল্য প্রভৃতি চারিপ্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে, এইভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে। অতএব এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাব স্বাভাবিক।

যাহাদের দ্বারা এই সকল ভাবের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে, তাহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক; কিন্তু পার্থিব পুত্র পতি প্রভৃতি দ্বারা এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে। কারণ তাহারা অপূর্ণ ও মলিন।

এই ভাবের তখনি পিপাসা শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু পূর্ণ ও নির্ম্মল হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান ভিন্ন আর নাই। অতএব এই ভাবগুলি দ্বারা যখন শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়, তখনি জীব প্রেমানন্দ তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে।

পশ্চিম দেশের বল্লভচারীরা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবে ভজনা করে, ইহা দাস্যও সখ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাতে দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা সখ্যের নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ এবং তদতিরিক্ত মমতাধিক্য আছে।

এইরূপ মধুর ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত এই চারি ভাবই জড়িত আছে। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী কখন স্বামীর দাসী হয়েন, কখন সখা হয়েন, কখন মাতার ন্যায় হয়েন, কখনও বা বক্ষ বিলাসিনী হয়েন। রামরায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্ত ভাবেই হয়।

আবার কান্তভাব মধ্যে রাধার ভাব শ্রেষ্ঠ। তিনি মহাভাব স্বরূপিণী।

প্রেম দুইরূপ, অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় এবং স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, যাহার হেতু নাই সে পরকীয়।* মাতা পুত্রকে ভালবাসেন, কারণ সে পুত্র। অন্য শিশু যদি তাহার পুত্র হইতে তবে তাহাকেও তিনি ঐরূপই ভাল বাসিতেন। এইরূপ স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন, কারণ তিনি স্বামী, অন্যব্যক্তি যদি তাহার স্বামী হইতেন, তবে তাহাকেও ঐরূপই ভাল বাসিতেন। কিন্তু একজন নারী পর পুরুষকে ভাল বাসিলেন, তাহার কোন কারণ নাই, ঐপুরুষ ব্যতীত আর কোন পুরুষে, সে প্রেম অর্পণ সম্ভব নহে। এইরূপ স্বার্থ গন্ধশূন্য প্রেম দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার সাধনাই সর্ব্বোত্তম। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের উপাস্য, তাহাকে স্বামী ও নিজকে পরকীয়া মনে করিয়া সাধনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে ভাবিতে হইবে যে,

বংশী গানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে। শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণচরিত,
সুধা সার স্বাদাবনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাশা ভস্ত্রার সমান॥

* অমিয় নিমাই চরিত, তৃতীয় খণ্ড।

কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই হউক ছারখার,
সেই বপু লৌহময় জানি॥

ব্রজলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে মনন করিতে করিতে ভক্তের মনে এই প্রকার স্ফুরণ হয় যেন, নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ভাসিতেছে, কর্ণে তাঁহার বংশীধ্বনি পশিতেছে, নাসিকায় তাঁহার অঙ্গ গন্ধ লাগিতেছে, অধর তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছে এবং হস্ত তাঁহার চরণতল স্পর্শ করিতেছে। মনের এই অবস্থা কেবল কল্পনার বিষয় নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ইহার দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেইভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥*

* * * * *

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥ (১)

* * * * *

প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া,
ভূমিতে পড়িল প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ (২)

অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,

---

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

(১) সপ্তদশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

(২) ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ (৩)

যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তাহার সাধন প্রণালীতে বিশ্বাসী, তাহার নিকট রাধা কৃষ্ণের প্রেম সাধারণ নরনারীর প্রেম নহে। নায়ক স্বয়ং ভগবান, নায়িকা মহাভাব স্বরূপিণী, তাঁহাদের প্রেমের লীলা সাহিত্য শাস্ত্র দ্বারা বিচার করা সঙ্গত নহে। বিশ্বাসীর নিকট রাধা কৃষ্ণের এই প্রেম "নিম্মল ভাস্করের" ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি প্রার্থনা করেন,

সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা
সেবে দুঁহার যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকট যাব
হেন দিন হইবে আমার॥

এইস্থানে আর একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারি আদর্শে সে প্রেমলীলা আঁকিয়া গিয়াছেন, অথবা আপনাদের গৃহে যে ছবি দেখিয়া ছিলেন, তাহাই রাধাকৃষ্ণ নামের রসায়ন দ্বারা উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়া ছিলেন? কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান,
বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে,
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি প্রেম ডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে,
রেখেছিল মগ্ন করি? এত প্রেম কথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করে লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে?

(৩) চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

এই প্রশ্নের উত্তর সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজ নিজ রুচি অনুসারে করিয়া লইবেন। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম পরকীয় ভাবের সাধকের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত করে, অনন্ত আনন্দের বিলাসে মনকে বিহ্বল করে। এই বিহ্বলতার চরম দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যে সম্ভোগ লীলার বিবরণ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই তাঁহার জীবনেও স্ফুরিত হয় নাই। অতএব বৈষ্ণব কবি সে আদর্শ কোথায় পাইলেন, তাহা দেখিতে হইবে। এই জন্যই বঙ্গীয় কবির কথার অনুমোদন করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে :—

এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন বেলায়।

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, বহির্ভাষা হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেও মানুষের মনমুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার সম্যক রসগ্রহণ করিতে হইলে চাবি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চাবি নাই, তাহা সাম্প্রদায়িক মতামতের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের কার্য্য, প্রকাশ করা; সাহিত্য তাহার বক্ষে প্রকৃতি ও মানুষকে প্রকাশ করে। প্রকৃতির প্রকাশে তাহার সৌন্দর্য্যের বিকাশই লক্ষ্য। মানুষকে প্রকাশিত করিতে হইলে, তাহাকে তাহার সময়ের এবং সমাজের ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং সে মানুষের মধ্যে সমাজের অবস্থা ও আদর্শ কতক পরিমাণে অবশ্যই ব্যক্ত হইবে। নানা সমাজ, নানা মত, নানা আদর্শ, কত বৈচিত্র্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এরূপ সত্য ও নীতি আছে, যাহার ললাটে রাজটিকা এবং যাহা সকল সমাজে, সকল দেশেও সকল সময়ে স্থায়ী রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছে, মানুষে মানুষে যতই অনৈক্য থাকুক না কেন, তাহার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা নদীর মত সাধারণত্ব আছে। এই সাধারণত্বই মানুষের প্রাণ, ইহা লইয়াই মানুষ, মানুষ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে মানুষের এই প্রাণ আর ঐ চিরন্তন সত্য ও নীতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই জাতি ধর্ম্ম সমাজ কাল নির্ব্বিশেষে পাঠককে আনন্দ দান করিতে পারে। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ধ্বনি কখনও লালসায় চঞ্চল, কখনও অনুরাগ বিহ্বল, কখনও মিলনে আনন্দপূর্ণ, কখনও বিরহে বেদনাময়, কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রগাঢ় প্রেমরাগে রঞ্জিত। এই ধ্বনি সকল কালের সকল সমাজের মনুষ্যহৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। এ জন্য বৈষ্ণবকবিতা পাঠে পাঠক মাত্রেই পুলকে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যের যাহা বিশেষত্ব, যাহা বৈষ্ণবের নিকট মধুর হইতে মধুরতর, তাহা অবৈষ্ণবের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিতে অসমর্থ; পরন্তু তাঁহারা উহাকে দোষযুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। তাদৃশ ক্রটীসত্ত্বেও শ্রীমতী রাধা শ্যামের বাশীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ভাষাতেই বৈষ্ণবকবিতার স্তুতি করিবেন।

কদম্বের বন হৈতে কি না ধ্বনি
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥

রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে জলে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রাত তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপে নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়া ওর॥

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ব্রাহ্মণ সমস্যা।

যখন ব্রাহ্মণ ভারতে অদ্বিতীয়, শাস্ত্রসাম্পদ তপোবান যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্ম্মের মধ্যে সেই বিশিষ্ট বর্ণের চিত্ত অনভেদ্য হইয়া বিরাজমান,—সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহত্বার বরণে তাঁহারা বরণীয় পবিত্র,—আপনাকে যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে মুক্ত রাখিয়া যখন তাঁহারা ভারতের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে নিস্তব্ধ সুরটি অবিচলিত ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন,—কর্ম্মীদলকে ঠিক পথটা দেখাইয়া দিতেছিলেন,—তখন ব্রাহ্মণ ছিল ব্রাহ্মণ, ভারতও ছিল ভারত। হিন্দু তখন nation ছিল। Indian peoples কথাটা কোন জাতিরই অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এ কথা তখন স্বপ্নেরও অতীত ছিল যে, ব্রাহ্মণ আবার বিশাল সমাজের মাঝখানে কোনও দিন সমস্যায় পরিগণিত হইবে। সেই-ই যে তখন সকল বিশালতার মধ্যে সামঞ্জস্যের একটা সুর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকল সমস্যাকে দিনে দিনে সমাধান করিয়া দিতেছিল।

সুতরাং ব্রাহ্মণ ভূদেব দেবতা বিষ্ণুরও নমস্য জগতের শিরোভূষণ, মানব জাতির উপাস্য কোনও কথাটাই মিথ্যা নহে। সকল কথারই সুস্পষ্ট সম্ভব অর্থ আছে। সকল অর্থগুলিই মানবে গ্রহণ করিতে পারে মানিয়া জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। পারে বলিয়াই প্রাচীন ভারত পারিয়াছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উন্নত ধর্ম্মের সমাবেশ বর্ণনা আমরা পাঠ করিয়া থাকি তাহা তখন আদর্শ মাত্র নহে—সত্যই আচরিত। ব্রাহ্মণেতর সাধারণের ব্রাহ্মণের প্রতি যে অচলাভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া থাকি তাহাও দাবী দাওয়া নহে—চলা এবং হওয়া। তখনকার দিনকালে ও সব শোনা কথা ছিল না। ও সব কল্পনা নহে,—বাস্তব।

যতদিন এই বিশিষ্ট বর্ণ সমাজের সকল সমস্যার উর্দ্ধে আপনাকে সমাসীন রাখিয়া সেগুলির মীমাংসার পথ দেখাইয়া আসিতে পারিয়াছেন ততদিনই অমনি গিয়াছে—ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণ এই শব্দটাকে এমন একটা সম্ভ্রমে মণ্ডিত রাখিয়া আসিয়াছেন যে,

সেই ধারাবাহিক মর্য্যাদার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া শব্দটী নিজেরই একটা স্বতন্ত্র সম্মোহিনী শক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। ঐ শব্দটীকে আমরা মন্ত্রের পর্য্যায়েও দাঁড় করাইতে পারি। ব্রাহ্মণ এই শব্দ জপ করা চলে,—চলে কেন, সন্নিহিত অতীতে ভারতবর্ষ তাহা করিয়াছেও।

যেমন শক্তির পরিবর্ত্তে ঘটের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা তেমনি ঐ ব্রাহ্মণ শব্দটার নামী যে দিন কালের আবর্ত্তে তলাইয়া গেল সে দিন নামেরই প্রতিষ্ঠা হইল। সেই জন্যই বলিতেছি সন্নিহিত অতীতে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ এই শব্দ জপ করিয়াই দিনাতিপাত করিয়াছে। শুধু তাহাই কেন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে অমনি করিয়া পুতুলও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নামকে উঁচাইয়া দিয়া—নামের জোরে নামীকে পাওয়া যায়। বিশ্বাসে নামার একটা মানুষের চেষ্টায় গড়া মূর্ত্তি সেদিন প্রতীক হিসাবে সমাজে খাড়া হইয়াছিল। সেই প্রতীক কল্পে কল্পিত পুতুলই বর্ত্তমানের ঝড় ঝাপটায় ভূতলশায়ী হইয়া প্রহসন ও ব্যঙ্গচিত্রে প্রদর্শিত "বাভ্যোন ঠাকুন" মনিষ্যিতে দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণত্বকে সজীব রাখিতে সমাজ যাহা গড়িয়াছিল তাহারই ক্রমঃসঙ্কোচ পরিণতি আজিকালিকার বামুন। ঐ গলায় পৈতা উড়িয়া পাচক হিন্দুস্থানী বিদেশের চাকুরীয়া বাঙ্গালী মিথ্যাসাক্ষ্যপেষা চালকলার পুঁটুলি সকলি সেই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ভাল জিনিষটার পচানি।

এমনই হয়। সুদূর অতীতের সে ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতিষ্ঠা আর সন্নিহিত অতীতের ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্রষ্টাই সৃষ্টি করিতে পারে। বিধির বিধানেই বিশ্ব গড়িয়া উঠে। সৃষ্ট মানুষের সে অধিকার থাকিলে তাহার সৃষ্টি এমন করিয়া ব্যর্থ হইত না। মন্বাদির বিধান যতখানি বিধির বিধানের আবিষ্কার সঙ্কলন ততখানিই নিত্য। সামাজিক শ্রেষ্ঠগণের প্রক্ষিপ্ত অংশই কালে কালে এত সঞ্চার ও অস্ত্রোপচার প্রয়োগের ঘটা ঘটাইয়া তুলিতেছে।

নিশ্চয়ই আমি এই সমস্ত কথার মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিবাদ করি নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা বর্ণ আছে তাহা নিত্য, তাহার কোনও দিন পরিবর্ত্তন নাই অনুকরণ করিয়াও সে বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চলে না, সমস্তই আমারো জ্ঞানে সত্য। আমি যে একটু স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বলিতেছি তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি অনুভব করিয়া এবং করাইয়া আমার সকল কথা বলিতে চাই। বলিবার ভঙ্গি যেমনই হউক ঐ যে চারিটী বর্ণের বিভাগ, আমি তাহা বিশ্বাসীদের অপেক্ষাও অকপটে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। রসায়নে ধাতুর মৌলিকত্বের ন্যায় মানব প্রকৃতিতেও ধাতুর মৌলিকত্ব বেশী বিন্যস্ত। আমার অনুভূত সত্যে চাতুর্ব্বর্ণের শ্রেণী বিভাগ সেই হিসাবেই নিখুঁত। অন্য প্রকারে হয়ত বা শত প্রকারেই বর্ণ বিভাগের ব্যাখ্যা আছে। আমি যেভাবে বুঝিয়াছি সেই ভাবটাই আমার কাছে সত্যলব্ধ। আমার সত্যলব্ধ ব্যাখ্যাকে আমি সত্য বলিয়াই শিরোধার্য্য করি কারণ আমার কাছে তদপেক্ষা স্পষ্ট অনুভবগম্য আর কিছুই হইতে পারে না। বর্ণবিভাগের যাথার্থ্য স্পষ্টই অনুভব করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মানবের এই চারি বিভিন্নতা মূল মানব প্রকৃতির ধাতুগত চারিটি মৌলিকত্ব অবলম্বন। বর্ণ বলিতে কি বুঝা যাইতে পারে? বর্ণ এই কথাটির অর্থব্যাখ্যাচ্ছলে যিনি যত পণ্ডিত হয়ত তিনিই তত দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীজাল বয়ন করিতে পারেন, সর্ব্বাপেক্ষা সরল ভাবেই মানব প্রকৃতির বর্ণনায় প্রযুক্তবর্ণের যাহা শব্দার্থ তাহাই আমি বুঝিতে পারি মাত্র। তাহাই আমার

সত্যের দ্বারা লব্ধবস্তু। ইংরাজিতে কথা আছে paint him in his true colour এই colour শব্দ যে শর্থের দ্যোতনা করে বর্ণ বলিতে আমিও তাহাই বুঝি। এই অর্থেই আমি বুঝিয়াছি ব্রাহ্মণ একটা বর্ণ অপর তিন শ্রেণীও তিনটি পৃথক্ পৃথক বর্ণ।

সকলের মূলে যিনি আছেন সৃষ্টি তাঁহা হইতেই বিবর্ত্তিত। সর্ব্বদর্শন ও বিজ্ঞানের মত একত্রিত করিলে এমনটাই দাঁড়ায়। অর্থাৎ অবশেষে এই কথাটাই হয় আসল কথা, বর্ণ সৃষ্ট পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং সৃষ্টির বাহিরেও নহে, সৃষ্টির যিনি মূল বর্ণ তাঁহা হইতে ও অভিন্ন নহে।

অবশ্য শাস্ত্রও তাহাই বলে। সে বলে বিভিন্ন বর্ণ বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অবয়ব সঞ্জাত।

ব্রাহ্মণ ও বর্ণ, আমরা ব্রাহ্মণের কথাই কহিতেছি। দেখিয়াছি একদিন ব্রাহ্মণকে, তিনি জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এমন এক ভঙ্গীতে আমাদের অভ্যন্তরে সমাসীন ছিলেন যে, সেটা মঙ্গল ও কল্যাণের নিমিত্তই ব্রাহ্মণোচিত জীবন-যাপন, বৈশ্যোচিত দোকানদারী নহে। তাঁহার মধ্যে সত্যের অকুণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত্তি দেখিয়া সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে গুরুর সম্মান দিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। তারপর দেখিয়াছি আর একদিন—সে কাহারা আপনাদের ব্রাহ্মণ নামীয় অধিকার সাব্যস্তোপযোগী রাশি প্রমাণ দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করিয়া একটা প্রতিষ্ঠিত আদর্শে স্বচ্ছন্দ চালিত সমাজের মধ্যে আপনার দখল সত্ব সাব্যস্ত করিতে নরকের জেলখানা স্বর্গের সিভিল সার্ভিস আর কোটী কোটী দেবতার সেনা শান্তিরক্ষক সাজাইতেই ব্যস্ত। সে দিনও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গিয়াছে— আবার আজ নূতন দিন আসিয়াছে—আজ দেখিতেছি আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা—দেখিতেছি প্রয়োজনের তাড়নায় চালিত সমাজে ব্রাহ্মণ নামীয় একটা মৌখিক সম্মান একটা পুতুল খেলার ঘরে সাজা বরের স্বামীত্বের মত কল্পিত প্রাধান্য—সকলেরই সঙ্গে সমান বৃত্তি, সমান ধর্ম, সমান জ্ঞান—সকলেরই মত জীবন সংগ্রামে গলদ্‌ঘর্ম, কর্ম্ম ক্লান্ত একটা সম্প্রদায় কায়ক্লেশে বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। বজায় রাখা আর কিছুই নহে আপনার ও পরের কাছ হইতে একটা স্বীকৃতি মাত্র। মোটামুটি তিনটা স্তর দেখাইলাম মাত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে ক্রমঃসঙ্কোচের বিবর্ত্তন উল্লেখ করিতে বসি নাই, ব্রাহ্মণ ইতিহাস রচনা এখানে লক্ষ্য নহে। তবে এইটুকু করিতেছি বটে—একটা সন্ধান আরম্ভ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ যদি এক হয় তবে সেই একত্ব কোথায়? আর এই স্তর পরম্পরার মধ্যে সেই একত্বকে ধরিয়া কোনওরূপ সামঞ্জস্য সম্ভবপর কি না?

একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এক একটা বর্ণ জাতি নহে, জাতির অভ্যন্তর বর্ত্তী বিভিন্ন থাক মাত্র। অবশ্য কোনও জাতির মধ্যেই বর্ণ সকলের পরস্পর পার্থক্য, বিভিন্নতাকে এত সুস্পষ্ট, ভাবে নির্দ্দেশিত করিয়া—স্বার্থ ও আচার বিচার বৃত্তি প্রভৃতিকে আলাদা করিয়া দিয়া, এমন করিয়া কায়েমী পাট্টায় তাহাদিগকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। মূল বর্ণভেদ সকল দেশেই আছে সর্ব্বত্রই মানব প্রকৃতি ধাতুগত মৌলিকত্বে বৈচিত্র সম্পন্ন। দেখা যায়, ভারতেতর দেশে এই বৈচিত্রের অভ্যন্তরতত্ব কেহ অনুসন্ধান করে নাই।

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়ামড়ি করিয়াই বিভিন্ন বর্ণগুলি উগ্র কর্ম্মকোলাহল মুখর একটা জীবন সংগ্রামের স্রোত রচনা করিয়াছে। সেখানে প্রকৃতি ভেদে বৃত্তি ভেদের ব্যবস্থা নাই। মনুষ্য জীবনে প্রয়োজনের ষ্টিম রোলারটা জীবন্ত মানুষগুলির উপর এমন নির্ম্মমভাবে গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বিনা প্রয়োজনের যে অংশটা মানুষের মধ্যে থাকে সেটা অমনি অবস্থায় পতিতের চূর্ণবিচূর্ণ অস্থিপঞ্জরের মত রেণু রেণু হইয়া গিয়াছে। ভারত যেদিন বর্ণ বিভাগ করিয়াছিলেন, সেদিন বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ সম্পদশালিনী তাহার ভূমিতে আপন সন্তানগুলিকে প্রয়োজনের তাড়া হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা তাহার সাধ্য ছিল। সে বিনা প্রয়োজনের যে একটা দিক আছে আপন সন্তানগুলিকে সেই দিকটাই দেখাইয়া দিয়াছিল। জীবনটাকে বজায় রাখিবার ব্যস্ততায় আপনাকে ভুলিয়া থাকার দরকার হয় নাই বলিয়া, তাহারা জীবনটাকে তন্নতন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতে, আপনাকে চিনিতে অবসর পাইয়াছিল। যে ভাব হিন্দুর বৈশিষ্ঠ্য ভারতের বানী তাহার জন্ম এইরূপেই সম্ভব হইয়াছে।

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত ছিল না বলিয়াই, ভারতবর্ষ প্রাণটাকে কত সুস্বাদ সহকারে উপভোগ করা চলে, তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। প্রকৃতির দয়াতেই মানুষ এখানে সম্পন্ন, সুতরাং সম্পদ ব্যবহার কত মহান গৌরবে করা চলে তাহারই সে পরীক্ষা করিতেছিল। তাই সে প্রকৃতিকে লইয়া এত নাড়াচাড়া করিতে পাইয়াছিল—তাই-ই অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণে তাহার এই বর্ণ বিভাগ আবিষ্কার। তাহার সমাজ আপনার সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ তাহার আবিষ্কারকে আপনার কাজে লাগাইয়াছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষ আপনার জীবন লব্ধ সত্যকে জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে ছাড়ে নাই।

সে প্রকৃতিভেদে বৃত্তিভেদ করিয়া এক এক মৌলিকত্ব সম্পন্ন প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট ভাবে আপনাপন লক্ষণ অনুসারে উপযুক্ত সম্পূর্ণ উপযোগী কাজ বাছিয়া লইবার পথ খুলিয়া দিয়াছিল। ইহার সুফল এই যে, মানুষের বিভিন্ন বৈচিত্র অবাধে আপন পথে ছাড়া পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিণতি লাভ করিতে থাকিবে। এক একটা কাজ ঠিক ঠিক উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া culture হিসাবেই পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

এইরূপে পার্থক্যদ্বারা জীবন সংগ্রামের অনিবার্য্য সংঘাত যথাসম্ভব সংযত করিয়া পরস্পরের অভ্যন্তরস্থ মূল ভাবস্বরূপ সত্যকে এক বলিয়া অনুভব করতঃ বর্ণ ধর্ম্মের বিভিন্নতাকে জাতি ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের অধীনে আনিয়া হিন্দু ছিল একটী nation

এই nationএর চালক ও ব্যবস্থাপক ছিল ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। এই ব্রাহ্মণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাঁহাদের রক্ষিত সমাজে তাঁহাদের স্থান ও কার্য্যপ্রণালী ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে হিন্দুর constitution of Government চিনিলে আমরা বুঝিব রাষ্ট্র সমস্যার কত সুন্দর সমাধান এই অধঃপতিত দেশের জীর্ণ পুঁথির মধ্যে অনাদৃত পড়িয়া আছে। তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে বর্ত্তমানের অন্বেষণ-আকুল জাতি সঙ্ঘকে Spiritual Democracyর সন্ধান দিয়া আমরা স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিব এমনও ভরসা করিতে পারি।

ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে যদি তাহার সত্যস্বরূপে আবার পুনর্জ্জীবিত করিতে পারি তবে

আমরা যাহা পাইব তাহার স্থান Political Independence হইতে অনেক উচ্চে। কারণ সে জিনিষটাকে আপনার মধ্যে গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমার দেশ সমগ্র জগতের উপর একটা ভাবের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবে, যাহার প্রভুত্ব রাজনৈতিক প্রভুত্ব অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর। অথচ লাভও অনেক, সেই ভাবের উপর সমাজটাকে পুনর্গঠিত করিতে পারিলে সমাজের ভিতরকার একটা কীটাণুকীটও হিংসার চাপে পীড়িত হইবে না। জীবন সংগ্রাম যতদূর সম্ভব সংযত হইবে, জীবন যাত্রা আদর্শ স্বরূপ হইবে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

কিন্তু ব্রাহ্মণ রক্ষা না পাইলে বর্ণাশ্রম রক্ষা পায় না, ব্রাহ্মণ গড়িয়া না তুলিলে বর্ণাশ্রম গঠন চেষ্টা নিরর্থক। ব্রাহ্মণের উপযোগীতাই ব্রাহ্মণের সম্মান ও পূজার কারণ।

এই জন্যই ব্রাহ্মণত্ব লইয়া এত সংগ্রাম। এই পদ হইতে জাতির মর্মের রসটুকুকে পাওয়া যায়,—এ জাতির রাজ সিংহাসনে বসিলেও যাহা মিলে না। ভারতে রাজার বেটার সিংহাসন কাড়িয়া লও, ক্ষতিটা তাহার মর্মান্তিক হইবে না, সে একটা বৈষয়িক ক্ষতিমাত্র। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাহার বেটাকে সেই ব্রাহ্মণ পদচ্যুত করিতে প্রয়াস পাও দেখি? দেখিবে তাহা পারিয়াই উঠিবে না।

কথাটাকে স্থূল রূপকের মধ্যে আনিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। যেন ব্রাহ্মণত্ব একটা পদ। কেন না এই ভাবে ভাবটাকে গ্রহণ করিলে সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ নামীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যত স্তর ভেদ অবলোকন করি তাহার রহস্যমধ্যে প্রবেশ সাধ্যগম্য হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মণের গুরুতর দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্ধান কার্য্যে অনেককেই নিরাশ হইতে হইয়াছে—এ নিরাশ আজিকার নহে—আমার প্রপিতামহগণও ইহার অংশভাগী, অল্প বুদ্ধিব্যয়েই তাহা বুঝিতে পারি। সুতরাং শাস্ত্র সমুদ্রে অবগাহন ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া, আজকাল যাহারা ব্রাহ্মণ নামীয়, তাঁহাদেরি মুখে যাহা শাস্ত্র বলিয়া শুনিলাম তাহারই দুই একখানা পাঠ করিতে আরম্ভ করা গেল। প্রথমেই একটা কথা দৃঢ়ভাবে বারবার পুনরুক্ত হইতে দেখিয়া সেটা মগজে ঢুকিয়া গেল। কথাটা বেদ। সকল শাস্ত্রই দেখিলাম একমত যে, বেদের রক্ষক বলিয়া ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্ব। জিনিষটা বেশই স্পষ্ট হইল যে, যাহারা বিধাতৃ বিধিত পরম শ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রাহ্মণ নহে, বেদ, বেদজ্ঞ বলিয়াই ব্রাহ্মণ। এমন কি একথাটুকুও কাজের কথা নহে যে ব্রাহ্মণ হইতে বেদের উৎপত্তি। শাস্ত্র দৃঢ়কণ্ঠেই বার বার বলিয়াছেন যে বেদ বিধাতৃবিধিত—বেদ অনাদি অনন্ত।

ব্রাহ্মণ কাহারা? ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লেখ—সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান এইরূপ চিন্তাধারী প্রজাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণু মৎস্য মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঠিক এইরূপ লিখিত আছে। সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান এই চিন্তাই বেদের মূল ভাব। সুতরাং বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ নামে কিছুই খাড়া করিবার উপায় নাই। প্রথম বিধাতা, তারপর বেদ, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর জাতিধর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি। ভারতবর্ষে ইহাই ধারা।

বিধাতা এবং বেদের স্বরূপ মানবের অজ্ঞেয়। ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞান পৌছিতে

পারে। এই ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিল? শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, হরিবংশে বলে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ হইতে—মহাভারতে এই বিরাট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বলাও হইয়াছে। আবার এমন কথাও আছে যে মনু হইতে ব্রাহ্মণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে উল্লেখ—বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় শতবৎসর যমুনা তীরে তপস্যা করিয়া পুত্র লাভের নিমিত্ত প্রভু হরির যজ্ঞ করায় আত্মসদৃশ দশ পুত্র লাভ করেন। সেই দশপুত্রের মধ্যে ইক্ষাকু জ্যেষ্ঠ।* * * মনুপুত্র করুষ হইতে কারুষ নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মবৎসল উত্তরাপথ রক্ষক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয় এইরূপ ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র হইতে ধাষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তাঁহারা অবনীতলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। * * * ভগবান অগ্নি অগ্নিবেশ্য নামে স্বয়ং তাহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিই কানীন ও জতুকর্ণ নামে বিখ্যাত। তাঁহা হইতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

পুত্র কামনায় তপস্যা এবং যজ্ঞের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি—আবার একজনেরই বিভিন্ন পুত্র হইতে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি, এ সকল কথার মধ্যে কি নিহিতার্থ এখন বুঝেই বা কে আর বর্ত্তমান যুগের মানুষকে বুঝাইতে পারেই বা কে?

আবার এই শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেই যে ধারায় পাশ্চাত্যের ইতিহাস লিখিত হয় সেই ধারা বাহিয়া নৃপতিগণের একটা বংশ তালিকা দেওয়া আছে। তাহাতে কেহ ক্ষত্রিয় হইয়া রাজা হইতেছেন, কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া সম্পদ প্রভুত্ব ত্যাগ করিতেছেন, কেহ বৈশ্যত্ব কেহ শূদ্রত্ব পাইতেছেন। রন্তিদেব ও অজমীঢাদির বংশাবলী ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। এই ভাবে দেখা যায় যে বর্ণ এবং বংশ এককথা নহে। জাতিশব্দও বর্ণের স্থলে সাধু প্রয়োগ নহে।

সমস্ত আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে মহাভারতেই বনপর্ব্বে সেই বিখ্যাত গল্পটা আছে যে গল্পের বহুদিন ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা নিরত কৌশিক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ নারীর নিকট অপ্রতিভ হইয়া ব্যাধের সমীপে শিক্ষা লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। যে গল্পে আমরা জানিতে পারি মাংস বিক্রেতা ব্যাধ সপ্রতিভ চিত্তে ব্রাহ্মণকে বলিতেছে—"হে ব্রহ্মণ অধিক কি কহিব যদি শূদ্রযোনি সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জব সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।"

তারপর শান্তিপর্ব্বকে মহাভারতের জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্বে শরশয্যাশায়ী আহত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার স্বেচ্ছামৃত্যুয়ের জন্য দীর্ঘ জীবনলব্ধ জ্ঞানের কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, তিনি কৈলাস শিখরে সমাসীন মহাতেজীয়ান দীপ্যমান মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ভরদ্বাজ যে কথা জানিয়াছিলেন সেই পুরাতন ইতিহাস অনুসারে বলিতেছেন দেখিতে পাই। ভৃগু বলিলেন, বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্মস্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমুদয় হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। আর যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা মিথ্যারত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচ পরিভ্রষ্ট, তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথককৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণেরা বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভবশতঃ জ্ঞানহীন হইল, সেই শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই, ইহা বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

অবশ্যই এই একাকার প্রাক্ পৌরাণিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, তাহাকে সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিব। এই একাকারের মানুষ ঐতিহাসিকগণের মেরু অথবা

কাস্পিয়ান তীরবর্ত্তী আর্য্য তাহাও অসম্ভব নহে। মোটের উপর আমি এ সকল দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি আমার যুক্তির সমর্থনের জন্য যে, বর্ণ মনুষ্যপ্রকৃতির বৈচিত্রের মৌলিকত্ব নির্ণয়। এই বর্ণের বিভাগের উপর আশ্রম এবং ধর্ম্ম রচনা করিয়া প্রাচীন ভারত আপনার সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি character foundationএর উপর স্থাপন করিয়াছিল। Policy এখানে অনাদৃত।

সোজা কথায় ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা।

অর্থাৎ বিশ্বরহস্য তলাইয়া বোঝার জন্য জ্ঞান গভীর, সমস্তের স্বরূপ অবগত হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি ও ভ্রম মুক্ত সত্য নিঃসংশয় হওয়ায়—বিশ্ব জীবনের নিশ্চিত পথটীর উপর অস্খলিত পদে দণ্ডায়মান এক সুমহান চরিত্র। এই চরিত্র সম্পদে সম্পদবান ব্রাহ্মণ আপনার সুমার্জ্জিত প্রকৃতি লইয়া অপরাপর সকল বর্ণের পুরোভাগে দাঁড়াইবেন সে আর বিচিত্র কি? তাহাই ত স্বাভাবিক। তাহাই দাঁড়াইয়াছিলেন। অপরাপর সকল বর্ণ বিশ্বজীবনের নিশ্চিত পথটি ধরিবার জন্য এই বর্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। ত্রুটি ভ্রম হইতে যথাসম্ভব মুক্ত থাকিবার জন্য বেদস্বরূপ ইঁহাদিগের বাণীকে রাজবিধির উপরে স্থান দিতেন। ব্রাহ্মণ ছিল সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ। জগতের গুরু। এ প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিতেই ঘটিয়া উচিত সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া পরিগণিত হইত মনে করিলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের স্বভাব ব্যতীত ব্রাহ্মণ্য লাভ শাস্ত্রমতেই দুষ্পাপ্য। শুধু তাহাই নহে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াও দুষ্কৃতকর্ম্ম বশতঃ শাস্ত্রের বিধানেই স্থানভ্রষ্ট হইতেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যে কথা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়াই আমি একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

শুধু তাহাই নহে মনুর শ্রাদ্ধের পাংক্তেয় ব্রাহ্মণে বাদ বিচারের ঘটা প্রথমাশ্রমের কঠোর বিধি ব্যবস্থা এমন কি রঘুনন্দনেরও স্থান বিশেষ নিরীক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রাহ্মণত্ব একটা School of discipline—বংশগত বা জাতিগত অধিকার নহে। যাহারা জাতির বিশিষ্ট ব্যবহারে জাতিকে চালাইবার জন্য, জাতির মূল ভাবটা ধরিয়া রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম তাঁহাদেরই বিধি পদ্ধতি। এই জন্যই স্মৃতিতে শাঙ্কর্য্যের সহিত ব্রাত্যেও পাতিত্যের বিধান। এই জন্যই সকল স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ ব্রুব কথাটা এত ব্যবহার করিয়াছেন, মনু ব্রাহ্মণ ব্রুবকে অব্রাহ্মণ অপেক্ষাও হেয় করিয়াছেন। "সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণ ব্রুবে।" ৭।৮৫

হয়ত ব্রাহ্মণব্রুব কথাটা অনেকেই শুনেন নাই। সংজ্ঞা নির্দ্দেশক শাস্ত্রের সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। মাত্র একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

বিপ্রঃ সংস্কার যুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদি কর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণ ব্রুব উচ্যতে॥

সরল সংস্কৃত, ইহার অনুবাদের প্রয়োজন নাই। "বামুনের ঘরের গরু" কথাটা যে গ্রাম্য কথায় চলিত আছে, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে অশাস্ত্রীয় নহে।

শ্রীসত্যবালা দেবী।

দুই দিক্ (২)।

(নব্যভারতের কয়েকটা প্রবন্ধ স্মরণে লিখিত)।

১ম। লক্ষ্যহীন বিচারে মূল প্রশ্ন ভুলিয়া যাইতে হয়।

২য়। সহজ কথাবার্ত্তার মধ্যে বিচারের বাঁধাবাঁধি অত্যাচার সৃষ্টি মাত্র। তাছাড়া উত্তর অপেক্ষা বিচারের প্রণালীটাই অধিক প্রয়োজনীয়। 'দুই দিক্' দেখিতে না শিখিলে সে প্রণালী আয়ত্ত হয় না। আর চলনসই একটা উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপারও নহে।

১ম। চলনসই নয়, চূড়ান্ত উত্তরই আবশ্যক।

২য়। সসীম বুদ্ধিতে সে অনন্তজ্ঞান অসম্ভব। নিউটন হইতে ডালটন পর্য্যন্ত সমস্ত পণ্ডিতই তাহার প্রমাণ।

১ম। চূড়ান্ত উত্তর কি তবে নাই ?

২য়। যে অখণ্ড সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সেই সত্যের মধ্যেই ইহা নিহিত আছে।

১ম। সে সত্য কোথায় ?

২য়। যেমন ঋষিবাক্যের মধ্যে।

১ম। ঋষিবাক্যকে সনাতন সত্যের আধার মনে করিবার কারণ কি ?

২য়। শাস্ত্র-পন্থীদিগের জীবন ও সাক্ষ্য অণুবীক্ষণাদি অপেক্ষা কম বিশ্বাস্য নহে।

১ম। ঋষিবাক্যের আর যতগুণই থাকুক তাহাতে স্বাধীনচিন্তাকে ব্যাহত করে।

২য়। স্বাধীনচিন্তা আগুনের মত, তাহা লইয়া খেলা করা চলে না। জগতের অবিরোধে যিনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই নিজের ব্যবস্থা নিজে করিবার যথার্থ অধিকার জন্মিয়াছে,—অন্যের পক্ষে স্বাধীনচিন্তা কথার কথা মাত্র। আর পূজনীয়ের অধীনতা 'পরাধীনতা'ও নহে।

১ম। নিজে ভুল না করিলে কেমন করিয়া ভ্রমসংশোধন ও শিক্ষালাভ হইবে ?

২য়। যে উদ্ধত ও অধীর সে ই নিজে না ঠেকিলে শিখিতে পারে না। যাঁহারা বিনীত ও শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। যে ভাবে "আমিই ঠিক্ বুঝিতেছি, নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি সব শিখিব, অন্যে যাহা শিখিয়াছে বা বলিয়াছে তাহা আমার নিকট মূল্যহীন,"—সে ব্যক্তি ইতিহাসকে বর্জ্জন করে। সে নিজেকেও গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ নিজের ভিতরের কথা শুনিবার জন্যও রীতিমত ধৈর্য্য ও বিনয়ের আবশ্যক।

১ম। কিন্তু ঋষি-বাক্যের বিরুদ্ধে প্রবলতম সাক্ষী ভারতের দুর্দ্দশা।

২য়। তাহা ত ঋষিবাক্য লঙ্ঘনেরই ফল ?

১ম। তাঁহারা যখন ত্রিকালদর্শী তখন প্রতিষেধ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করেন নাই কেন ?

২য়। শীতের পর গ্রীষ্ম ও দিনের পর রাত্রির ন্যায় সত্যসাধনায় অনুরাগ ও বিরাগ পর্য্যায়গামী,—এ পর্য্যায় কালধর্ম্ম বা প্রকৃতির নিয়ম। তাহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই। তবে সনাতনপন্থার যাহারা পথিক তাহারা পড়িয়া আবার উঠে, নতুবা একবারের পতনই মৃত্যুর কারণ হয়। শত শত বুদ্ধিমান্ জাতি মরিয়াছে,—হিন্দু মরিয়াও মরিতেছে না।

১ম। ঋষিবাক্যের গণ্ডী টানিয়া তাহার মধ্যে অচলভাবে বসিয়া থাকাই কি তবে পরম পুরুষার্থ ?

২য়। ঋষিবাক্য 'সচল'—বেদ ও স্মৃতিগুলিই তাহার প্রমাণ,—তাহাতে গণ্ডী বা অচলতার সমর্থন করে না। Power Houseএর ভিতর চলাফেরা করিতে গেলে বিশেষজ্ঞের সতর্কতা

বাধা উপেক্ষা করিলে চলে না। সংসার-পথও 'সঙ্কট এবং কণ্টকময়.'—সেখানে কি সতর্কতা-বাক্যের প্রয়োজন নাই?

১ম। কিন্তু ভারতীয় জীবনের নিশ্চেষ্টতা অমার্জ্জনীয়।

২য়। পরের দেশকে আত্মসাৎ বা আত্মসাৎ করিবার জন্য একলাফে সাগরপার হইতে না পারিলে কি সচেষ্টতা সাব্যস্ত হয় না? উচ্চস্তরে শঙ্করাদি যুগাবতারের আবির্ভাব, মধ্যস্তরে সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কলা ও শিল্পশাস্ত্র, এবং নিম্নস্তরে পিতৃমাতৃসেবা, আতিথেয়ত আমোদ-আহ্লাদ কৌতুক, পরিশ্রম ও বর্ণচর্চ্চা এখনও কি নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ?

১ম। ইউরোপের তুলনায় ভারত সত্যই নিশ্চেষ্ট।

২য়। ইউরোপের সহিত ভারতের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সেখানে নির্দ্দয়া প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই বাঁচিতে হয়, ভোগ্যবস্তু দুর্লভ এবং দেহরক্ষা দুষ্কর,—কাজেই মানুষ ভোগলোলুপ ও দেহাত্মবুদ্ধি, এবং কাজকর্ম্মের মধ্যে সমবস্থলভ ছুটাছুটি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবিশ্বাস। এখানে ঠিক্ বিপরীত,—সুজলা সুফলা শ্যামময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে খেলিতে খেলিতেই লোকে মানুষ হয়, ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর এবং দেহ রক্ষা সহজ, কাজেই ভোগস্পৃহা সংযত ও দেহবুদ্ধি নিস্তেজ, এবং কাজকর্ম্মের মধ্যে শান্তি ও প্রাচুর্য্যসুলভ সন্তোষ প্রীতি ও বিশ্বাস। সাধ্য এবং সাধনা সম্বন্ধেও গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সেখানে উদ্দেশ্য বাহ্য-প্রকৃতি জয়, অস্ত্র সমর, এখানে উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রকৃতি জয়, অস্ত্র আত্মসমর্পণ। উভয় পক্ষই অনন্তপথের পথিক, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান উভয়ই সীমাহীন; একজন বলিতেছেন, তিল তিল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বিশ্বজগৎকে নিঃশেষিত করিব, আর একজন বলিতেছেন, সোঽহংতত্ত্ব-নাশী ক্ষুদ্র অভিমানকে বিনষ্ট করিয়া বিশ্বরহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। উভয়েই অশ্রান্তকর্ম্মা। ইউরোপের চেষ্টা প্রধানতঃ বাহিরকে লইয়া—সুতরাং চোখে পড়ে, ভারতের চেষ্টা প্রধানতঃ ভিতরকে লইয়া—সুতরাং লোক-লোচনের অগোচরেই থাকিয়া যায়। উভয়েই জ্ঞানবলে বাহ্যপ্রকৃতির উপর খানিকটা কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ, ভোগপ্রবণ শক্তিকামী ইউরোপ তাহাদ্বারা রেলগাড়ী ও উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, ত্যাগশীল মুক্তিকামী ভারত নালিকাস্ত্র এবং বারুদ ('বৃদ্ধি') এর স্রষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তৎসম্বন্ধে উদাসীন।

১ম। কিন্তু ভারত যে নিজের দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচাইতে পারিতেছে না?

২য়। কিছুদিন পরে তাহা সখ্য-শৃঙ্খলে পরিণত হইতেছে বলিয়া। সামরিকগুণে জয়লাভ করে, কিন্তু মানবিকগুণেই টিকিয়া থাকে, তাই জেতৃদলের সহিত ভারতের সখ্যসম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাই ভারতীয় মানব-ধর্ম্মের প্রচারক রবীন্দ্রনাথ রণক্লান্ত বিপন্ন ইউরোপের নিকট সেদিন ত্রাণকর্ত্তার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

১ম। রবীন্দ্র নাথ অসাধারণ পুরুষ, কিন্তু ভারতীয় জন সাধারণ কি সম্মানের আসন অধিকার করিয়া আছে?

২য়। জনসাধারণ মোটামুটি সকল দেশেই সমান। কোথাও মদ খায় ও ডাকাতি করে, আবার কোথাও ঘুমায় ও জুয়া খেলে। জন্ পাউণ্ড্স্ ও কবীর উভয়ত্রই আছেন। আর মধ্যস্তরে আছেন নিরীহ গৃহস্থগণ, যাহাদের প্রধান কাজ মানিয়া চলা এবং কোন মতে ভদ্রও শোভনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। তবে একটু তফাৎ এই যে, এখানে মা বসুন্ধরার কৃপায় ও জলবায়ুর গুণে জীবন-ব্যাপারে ইউরোপের উগ্রতা নাই, আর উপযুক্ত ফল হয় না বলিয়া চেষ্টারও তাদৃশ প্রবলতা নাই। সেখানে দেশ ধনী, রাজা মুক্তহস্ত, এখানে দেশ দরিদ্র এবং সরকার সৈন্য ও পুলিশ পালনেই রিক্তহস্ত, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই সাধারণের পক্ষে তুলসীতলার মাটাই একমাত্র ব্যবস্থা। ইউরোপের আস্তিক মহলেও এই নৈরাশ্যের 'শীর্ণি' যে বড় কম আছে তাহা নহে।

১ম। হাঁচি টিক্‌টিকির উপদ্রব বোধ হয় সেখানে কিছু কম?

২য়। কম না হইলেও ক্ষতি ছিল না। স্বয়ং যীশু ডেভিলে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার ত্রাণকর্তৃত্বে ব্যাঘাত হয় নাই। ইংরাজ নাবিকেরা যারপরনাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহা বলিয়া নৌযুদ্ধে তাহাদের কৃতিত্ব কম নহে। গুণে দোষ ঢাকিয়া দেয়, এমন কি নূতন দোষের সৃষ্টিও করে। একদিকের লাভ অপরদিকে ক্ষতির আকারে হাজির করিয়া দেওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম। দোষশূন্য গুণ জগতে দুর্লভ,—দোষবর্জ্জন করিতে গেলে গুণটীকেও সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন করিতে হয়। ইউরোপ কেবল হাঁচি টিকৃটিকি ছাড়ে নাই,—বাইবেলও ছাড়িয়াছে। তাই জ্ঞানিগণ কুসংস্কার বিনাশের দিকে অধিক লক্ষ্য না করিয়া সুসংস্কার প্রতিষ্ঠার দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সব নূতন দোষের সৃষ্টি হয় সেগুলিকে অপরিহার্য্য অমঙ্গল বোধে সহ্য করিয়া থাকেন। আগে লোকে হাঁচি টিকৃটিকি মানিত, এখন ভোগসর্ব্বস্ব জীবনকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া মানে,—কে বলিবে কোন্‌টা অধিক কুসংস্কার? শেষ কথা ত্রুটীশূন্য জ্ঞান আবরণ-শূন্য সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বোধ হয় বাহুল্য-বর্জ্জিত পরিচ্ছদের ন্যায় অশোভন।

১ম। ওকালতী দ্বারা 'হয়' কে 'নয়' করা যাইতে পারে, কিন্তু সত্য যা তা সত্য থাকেই। আমরা যে ঘরে বসিয়া উপবাস করিতেছি, আর অপরে যে আমাদের অন্নে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছে ইহা কি অস্বীকার করা যায়?

২য়। কুসংস্কারের সহিত সে দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নাই, বরং এই অপেক্ষাকৃত সুসংস্কারের যুগেই তাহার সৃষ্টি। রাজায় প্রজায় ন্যায্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই উহার অবসান হইবে। কিন্তু ইংরাজ নিজের ভাগ্য-গৌরবকে আজিও বিজয়-গৌরব বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, এবং প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া প্রজার সহিত ভ্রাতৃত্বচর্চ্চার অবসর পাইতেছেন না। খুব সম্ভব নিরুপদ্রব অসহযোগের ফলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে,—ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ইংরাজের চক্ষুরুন্মীলন হইবে।

১ম। কিন্তু ইংরাজের ভারতাধিকার যে বিধাতার বিধান?

২য়। চক্ষুরুন্মীলনও কি সেই বিধাতারই বিধান হইতে পারে না?

১ম। তাহার উপায় ত একটা বিরোধ-সৃষ্টি?

২য়। এ বিরোধ সৃষ্ট নহে, অপরিহার্য্য। দুই বিভিন্ন জাতির—দুই বিভিন্ন সভ্যতার—রাসায়নিক সংযোগ উপলক্ষে কিছু উত্তাপের উৎপত্তি হয়ই। মুসলমানের সহিতও হিন্দুর সংযোগ একদিনে এবং বিনাবিরোধে সম্পন্ন হয় নাই।

১ম। সে সংযোগ যতটুকু হইয়াছে তাহা ইংরাজ শাসনের কৃপায়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেও অনেক বাকী। ভারতীয় মুসলমান কি সত্যই খলিফাকে ছাড়িয়া কোন দিন ভারতীয় হিন্দুর সহায়তা করিবে?

২য়। ইংরাজ আমলের রাজনৈতিক সৌহৃদ্যকে মিলন বলে না। হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত আত্মীয়তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাহিরে পল্লীজীবনের বহু পুরাতন 'চাচা' 'ভাই' সম্পর্কের মধ্যে অনুসন্ধেয়। এ আত্মীয়তা কোন পক্ষই সহজে ভুলিতে পারিবে না। আর ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত দেশবুদ্ধির বিরোধও নাই। "সীজারকে সীজারের প্রাপ্য ও ভগবান্‌কে ভগবানের প্রাপ্য বুঝাইয়া দাও"—ইহা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের উক্তি। একের অধিকার আধ্যাত্মিক, অন্যের অধিকার ইহলৌকিক। তাই গত যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্মগুরুকে মাথায় রাখিয়া তাঁহার ঐহিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তবে যদি বাস্তবিকই কোন দিন ভ্রান্তবুদ্ধিবশে তাহারা খলিফার স্বার্থে ভারতের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলেও হিন্দুর পক্ষে চিন্তার কারণ নাই। কুড়ি কোটী হিন্দু ভারতের ভিতরে বসিয়া যদি নিজের জোরে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে পরের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া কি সে স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে? যে দুর্ব্বল অপরে তাহাকে সাহায্য করিবার সুযোগ খুঁজিবে, অধীন করিবার জন্য,—ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। সুতরাং সে প্রশ্নের বিচার এখন অনাবশ্যক। উপস্থিত কর্ত্তব্য

কিন্তু সুস্পষ্ট। ধর্ম্মের নামে মুসলমান হিন্দুর দ্বারে উপস্থিত,—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কি তাহাকে বিমুখ করিবে? তা ছাড়া ভারতীয় হিসাবে মুসলমান হিন্দুর ছোট ভাই। 'হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে ছোট ভাই বিরুদ্ধাচরণ করিবে' এই শঙ্কায় কি বড় ভাই এখন হইতে তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারে? রাজনীতির হিসাবেও ইহা নিন্দনীয়, মুসলমানকে যদি আপন করিতে বাকীও থাকে স্নেহ দ্বারাই সেটুকুর পূরণ হইবে,—সন্দেহ দ্বারা নহে।

১ম। তবে ইংরাজ সম্বন্ধে স্নেহ-বিমুখতা কেন?

২য়। ইংরাজ এখনও ভারতবাসী হন নাই, আর তা ছাড়া বিদ্বেষ যেটুকু দেখা যায় তাহা বাহিরে—অন্তরে নহে।

১ম। বাহিরেই বা কেন? আমরা যে ইংরাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ?

২য়। ঋণ শোধ হউক বা না হউক কৃতজ্ঞতার পবিত্র স্মৃতি চিরজীবন বহন করাই উচিত। কিন্তু ইংরাজ হিসাবী জাতি,—দাসত্বলোপ পর্য্যন্ত হিসাবী বুদ্ধিতে করিয়াছিল,—তাহারা যে পরিশোধ সম্ভাবনা না থাকিলেও ঋণ দিয়াছে একথা সহজে বিশ্বাস করিবার নয়। ভারতও কিছু কিছু শোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইংলণ্ডের কুবেরত্ব ভারতাধিকারের পর হইতে, তাহার সেদিনকার জগজ্জয় শিখগুর্খার রক্তে।

১ম। ইংরাজের রাজত্ব মুসলমানের তুলনায় রাম-রাজত্ব। মুসলমান অত্যাচারের সাক্ষী শিবাজী ও প্রতাপ, ইংরাজের বিরুদ্ধে সেরূপ সাক্ষী কোথাও নাই।

২য়। হৃতগৌরব মুসলমানের নিন্দা প্রবর্যোচিত নহে। তাহাদের 'অত্যাচার' নয়—উদারতা ও অসতর্কতার জন্যই শিবাজী ও প্রতাপের উদ্ভব হইয়াছিল। এখন পুলিসের কার্য্যদক্ষতায় রাজদ্রোহের সমস্ত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ইহা স্থায়িত্বকামী রাজার শাসন যন্ত্রের কৃতিত্ব,—কিন্তু সুশাসনের অন্য প্রমাণ আবশ্যক। মুসলমানকে নির্ব্বোধ বলিতে পারা যায়,—প্রকৃত অপরাধীকে ধরিতে পারিত না, স্পষ্টবাদীকে ফাঁসি দিত এবং সমস্ত ভারতের ধনবল ও জনবলের অধীশ্বর হইয়াও দুএকটা নগণ্য লোকের মুখের কথায় বিচলিত হইয়া হঠকারিতার পরিচয় দিত ও অনর্থক দুর্নাম সংগ্রহ করিত। কিন্তু একটা কথা মুসলমান সম্বন্ধে মনে রাখা কর্ত্তব্য:—গোঁয়ার হইলেও তাহাদের শাসনে লোকে খাইতে পাইত এবং অপরকেও খাওয়াইতে পারিত, আর বল, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম বুদ্ধি ও আয়ু আজকালকার তুলনায় অধিকই ছিল। নব্যন্যায়ের ও সৃষ্টি মুসলমান যুগে।

১ম। চিন্তা ও নারীজাতির মুক্তি, অস্পৃশ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের আংশিক উচ্ছেদ, এবং জাতীয়তা বুদ্ধির উন্মেষ ইংরাজ শাসনের সুমহৎ দান।

২য়। এসমস্ত 'দানের' দাতৃত্বে, মহত্বে, এমন কি অস্তিত্বে পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও সন্দেহ আছে।

১ম। চিন্তার মুক্তি কাহার দান?

২য়। চিন্তার স্বাধীনতা ভারতে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল,—তাই বেদনিন্দুক চার্ব্বাকের দর্শন আজিও জীবিত, এবং অসীমের পার্শ্বেই নিগমশাস্ত্রে দেবীমুখোক্ত বলিয়া পূজিত। নূতন মতবাদের জন্য কারা ও প্রাণদণ্ড ইউরোপ খণ্ডেরই সুমার্জ্জিত প্রথা। তবে যদি কেহ মনে করেন যে পিতৃপিতামহগণের ধরণে বিচার করার নাম চিন্তার দাসত্ব, আর অপরিচিত বিদেশীর নির্দ্দেশমত বিচার করার নাম চিন্তার স্বাধীনতা তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আজকালকার অধিকাংশ 'স্বাধীন চিন্তাই' পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তিতর্কের পুনরুদ্গীরণ মাত্র। এই চিন্তায় যাঁহারা ধুরন্ধর তাঁহারা স্বদেশের দীর্ঘসঞ্চিত জ্ঞানকে অজ্ঞানতা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন,—একবার নিকটে গিয়া তাহার স্বরূপ বিচার পর্য্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন না। slave mentalityর এরূপ হীন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। ইহা বিলাতী শিক্ষার সুমহৎ দান।